আমাদের শাদা বাড়ি

হুমায়ূন আহমেদ

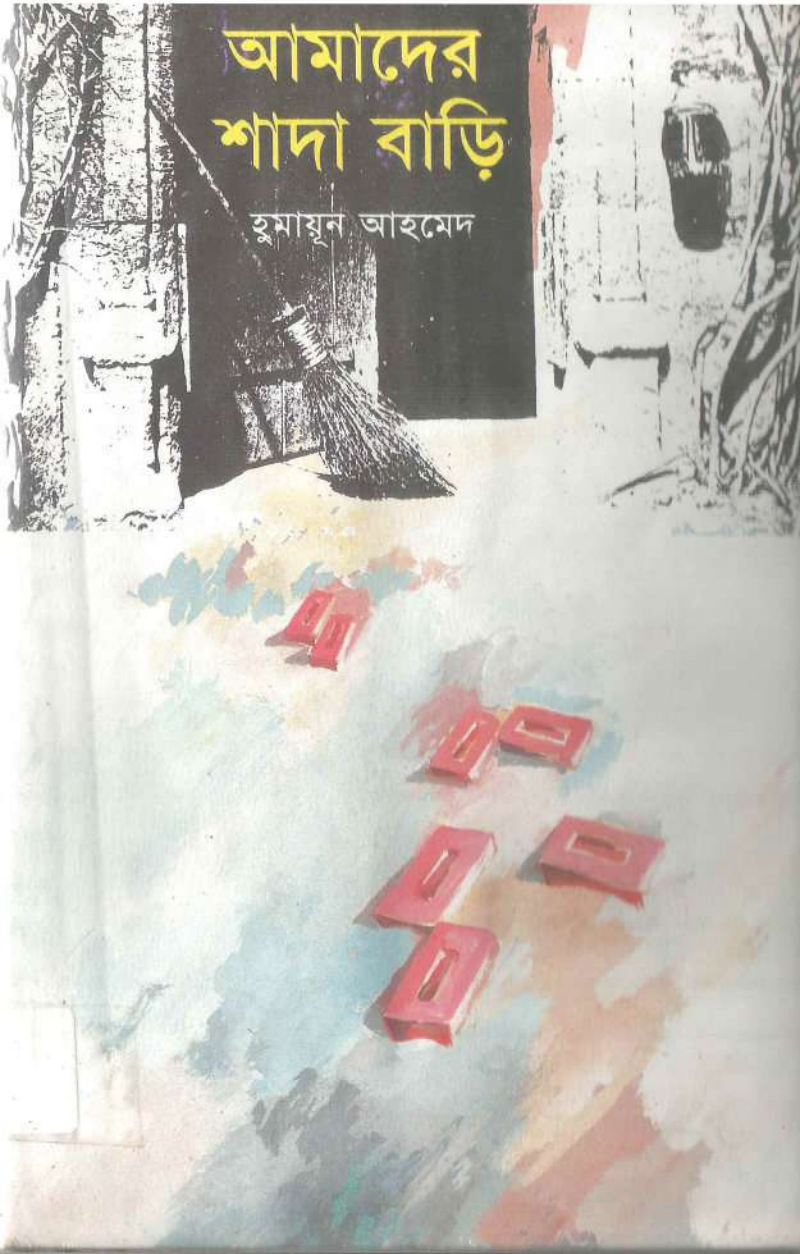

আমাদের বাড়িতে সকালের দিকে হইচই একটু বেশি হয়।

আমার মা, বয়সের কারণেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক সকালবেলায় রেগে আগুন হয়ে থাকেন। যাকে দেখেন তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। ঝড়ের প্রবল ঝাপ্টা বেশিরভাগ সময় আমার বড় ভাইয়ের উপর দিয়ে যায়। বেচারার দোষ তেমন কিছু থাকে না—হয়তো টুথপেস্টের টিউবের মুখ লাগানো হয় নি, কিংবা বাথরুমের পানির কল খোলা—এই জাতীয় তুচ্ছ ব্যাপার। রেগে আগুন হবার মতো কিছু না।

আজো বেচারা বকা খাচ্ছে। মার গলা ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। অন্যপক্ষ চুপচাপ। বড় ভাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেও কিছু বলছেন না, কারণ কথা বললেই বিপদ। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—নীরবতা। মার একতরফা কথাবার্তা থেকে যা বোঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে বুনোভাই দাড়ি শেভ করেন নি। বড় ভাইয়ের ডাকনাম বুনো। আমরা সবাই তাঁকে বুনোভাই ডাকি। যার নাম বুনো তাঁর স্বভাব-চরিত্রে বন্যভাব প্রবল হওয়ার কথা। তা কিন্তু না। বুনোভাই খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ। এই যে মা তুফান মেল চালাচ্ছেন তিনি একটা শব্দও করছেন না। মিটিমিটি হাসছেন।

মা হড়বড় করে বলছেন, তুই ভেবেছিস কী? তোর অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছি। গতকালও তুই শেভ করিস নি। আজো না। তোর মখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঘরে কি ব্লেড কেনার টাকা নেই? নাকি তোকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দেয়া হয় না? হাসছিস কেন? এত কিছু শোনার পরেও তোর হাসি আসে? হাসি খুব সস্তা হয়ে গেছে?

মার গালাগালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। শব্দটা টিউবওয়েলের। টিউবওয়েলের পাম্প চেপে আমরা দোতলার ছাদে পানি তুলি। ট্যাঙ্কে পানি তোলার জন্য আমাদের কোনো ইলেকট্রিক পাম্প নেই। ওয়ান হর্স পাওয়ারের একটা পাম্প কিনলেই কাজ হয়। সেই পাম্প কেনা হচ্ছে না, কারণ আমার বাবার স্বাস্থ্য বাতিক। তিনি ঘোষণা করেছেন সকালবেলা সবাইকে খানিকক্ষণ টিউবওয়েলে পানি পাম্প করতে হবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। পানি তোলা হবে, স্বাস্থ্যও রক্ষা হবে। শুরুতে আমরা সবাই বেশ উৎসাহ নিয়ে পানি তুলেছি। এখন আর কেউ উৎসাহ পাচ্ছি না। এ বাড়ির একমাত্র কাজের ছেলে জিতু মিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে তার হাড় জিরজিরে শরীরে মিনিট বিশেক পাম্প করে তারপর দুহাতে বুক চেপে বসে পড়ে। বড় বড় করে নিশ্বাস নেয়। এই দৃশ্য দেখলে যে কোনো লোক ভাববে, আমরা বোধহয় হৃদয়হীন। তবে দেখে দেখে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে বলেই এখন আর খারাপ লাগে না। শুধু বুনোভাই এখনো অভ্যস্ত হতে পারেন নি। তিনি রোজই জিতু মিয়াকে সাহায্য করতে যান

এবং একনাগাড়ে খুব কম করে হলেও এক ঘন্টা ঘটাং ঘটাং করেন। এমন চমৎকার একটি ছেলের ওপর মা শুধু শুধু এত রাগ করেন, কে জানে কেন।

অন্যদিন মিনিট দশেকের মধ্যেই মার দম ফুরিয়ে যায়। আজ ফুরুচ্ছে না। এখন বুনোভাইয়ের অকর্মণ্য স্বভাবের ওপর লেকচার দেয়া হচ্ছে। তাঁকে তুলনা করা হচ্ছে অজগর সাপের সঙ্গে। যে অজগর একটা আস্ত হরিণ গিলে এক মাস চুপচাপ শুয়ে থাকে। মার এই উপমা খুব খারাপ না। অজগর সাপের শুয়ে থাকার সঙ্গে বুনোভাইয়ের বিছানায় পড়ে থাকার মধ্যে বেশ মিল আছে। তাঁকে টেবিল-চেয়ারে বসে কোনোদিন পড়তে দেখি নি। যাবতীয় পড়াশোনা তিনি করেন শুয়ে শুয়ে।

'তুই হচ্ছিস অজগর, বুঝলি? অ-তে যে অজগর, সেই অজগর।'

'ঠিক আছে মা, এখন শান্ত হও। আমাকে বকে বকে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তুমি একটু বিশ্রাম নাও মা। শান্ত হও।'

মা শান্ত হলেন না। আরো কী-সব বলতে লাগলেন। মার চিৎকার প্লাস জিতু মিয়ার ঘটাং ঘটাংঙের সঙ্গে যুক্ত হল আমার বড় আপার দুই কন্যা রিমি ও পলির চিৎকার। এই দুই কন্যা কান ঝালাপালা করে দিতে লাগল। বড় আপা গত চার মাস ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন। আরো দু মাস থাকবেন, কারণ দুলাভাই কী একটা ট্রেনিঙে নিউজিল্যান্ড গিয়েছেন ছ'মাসের জন্য। রিমি এবং পলি এই চার মাসে চিৎকার করে আমাদের মাথার পোকা নাড়িয়ে দিয়েছে। এদের কিচ্ছু বলার উপায় নেই। কিছু বললেই সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এরা তাদের মার কাছে নালিশ করবে এবং লোক-দেখানো নাকীকান্না কাঁদবে। আমি একবার মহাবিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, এই রিমি, আর একটা শব্দ করলে চড় খাবি। জন্মের মতো চিৎকার করার শখ মিটিয়ে দেব। রিমি চোখ বড় বড় করে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর লাফাতে লাফাতে তার মার কাছে গেল। বড় আপা সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চলে এলেন। তাঁর মুখ থমথমে গলার স্বর ভারি। মনে হচ্ছে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলবেন । তাঁর কান্নারোগ আছে।

'রঞ্জু, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'কী কথা?'

'দরজটা বন্ধ কর, বলছি।'

'এমন কী কথা যে দরজা বন্ধ করে বলতে হবে?'

বড় আপা নিজেই দরজা বন্ধ করে আমার সামনের চেয়ারে এসে বসলেন এবং চাপা গলায় বললেন, আমার মেয়েগুলোকে তুই দেখতে পারিস না কেন? ওরা কী করেছে?

আমি পরিবেশ হালকা করার জন্য হাসতে হাসতে বললাম, 'কী যে বল আপা, ওদের তো আমি খুবই পছন্দ করি। পরীর মতো দুই মেয়ে। দেখতে পারব না কেন?'

'কেন সেটা তো তুই বলবি। তোর কাছ থেকেই শুনতে চাই। খানিকক্ষণ আগে রিমি কী করছিল? বল, কী করছিল?'

'চিৎকার করছিল।'

'বাচ্চারা চিৎকার করবে না?'

'করবে। তবে সারাক্ষণ করবে না এবং চিৎকার থামাতে বললে থামবে। এদের মুখে কোনো ব্রেক নেই।'

'সে চিৎকার করেছিল শুধু এই কারণে তুই তাকে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিবি? বাচ্চা একটা মেয়ে।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'কী বলছ আপা? চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেব কেন?'

'আবার অস্বীকার করছিস? তোর লজ্জাও লাগে না? কয়েকটা দিন শুধু আছি তাও সহ্য হচ্ছে না? আমরা কি জন্মের মতো তোদের ঘাড়ে এসে চেপেছি? আমরা কি সিন্দাবাদের ভূত যে নামাতে পারবি না? আর আমাদের যদি তোর এতই অসহ্য হয় সেটা বলে ফেল্—চলে যাই। এমন তো না যে যাবার জায়গা নেই। ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে এসেছি—তালা খুলে ঘরে ঢুকব।'

'আপা, ব্যাপারটা হচ্ছে কী...'

'থাক, তোকে ব্যাপার বলতে হবে না। ব্যাপার আমি বুঝতে পারি। আমার কি চোখ নেই? আমার চোখ আছে। দুই-এ দুই-এ যে চার হয় তা-ও আমি জানি। তোরা কেউ এখন আমাদের সহ্য করতে পারছিস না। বাবা সেদিন পলিকে ধমক দিলেন। আমার সামনেই দিলেন। আমি তো হতভম্ব। আমার সামনে আমার মেয়েকে ধমক দেবেন কেন?'

বড় আপা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপাতে লাগলেন। তাঁকে নিয়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। তাঁর মনে একটা ধারণা ঢুকে গেছে যে এ বাড়িতে আমরা তাঁকে পদে পদে অপমান করছি। অপদস্থ করার চেষ্টা করছি।

একই মায়ের পেট থেকে আমরা পাঁচ ভাইবোন এসেছি। পাঁচজনই সম্পূর্ণ পাঁচ রকম। বড় আপা অসম্ভব সন্দেহপরায়ণ। ঝগড়াটে এবং ছিচকাঁদনে। বুনোভাই চুপচাপ ধরনের। কোনো কিছুতেই তিনি রাগ করেন না। এম.এ. পাস করেছেন চার বছর আগে। এই চার বছরে চাকরির কোনো চেষ্টা করেন নি। আমাদের দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় আছেন—শিল্পমন্ত্রী। তাঁকে ধরাধরি করে নারায়ণগঞ্জের একটা মিলে তাঁর জন্য চাকরি যোগাড় করা হল। ভালো চাকরি. ছত্রিশ হাজার টাকার মতন বেতন। কোয়ার্টার আছে। দেড় মাস সেই চাকরি করে একদিন সুটকেস নিয়ে বাসায় চলে এলেন। এই চাকরি নাকি ভালো লাগে না। তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করা হল। কোনোই লাভ হল না। মা যত রাগ করেন বুনোভাই তত হাসেন। বড়দের কোনো ছেলেমানুষি দেখে আমরা যেমন হাসি সে রকম হাসি। মা রাগী গলায় বললেন, 'এই চাকরি তোর পছন্দ না। কী চাকরি তোর পছন্দ?'

'কোনো চাকরিই পছন্দ না, মা।'

'কী করবি তাহলে?'

'কিছুদিন রেস্ট নেব।'

'রেস্ট নিবি মানে? রেস্ট নিবি-এর মানেটা কী?'

'রেস্ট নেবার মানে হচ্ছে বিশ্রাম করা। কিছুদিন বিশ্রাম করব বলে ঠিক করেছি, মা।'

'বিশ্রাম করবি?'

'হ্যাঁ। শুয়ে-টুয়ে থাকব। বই-টই পড়ব।'

সত্যি সত্যি বুনোভাই পরের এক মাস শুয়ে শুয়েই কাটালেন। হাতে একটা পত্রিকা কিংবা বই। সে বই মুখের উপর ধরা। পা নাচাচ্ছেন। মুখ হাসি হাসি। যেন তিনি বড়

আনন্দে আছেন। রিমি এবং পলি বেশিরভাগ সময় তাঁর ঘরেই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে। তিনি ফিরেও তাকান না। তাদের চিৎকার, চেঁচামেচি তাঁর কানে ঢোকে বলেও মনে হয় না। সেই তুলনায় আমার মেজোভাই খুব প্র্যাকটিক্যাল। মেজোভাই ইন্‌জিনিয়ারিং পড়েন—ফাইন্যাল ইয়ার। রাতদিন পড়াশোনা নিয়ে আছেন।

পাস করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাইরে যেতে পারেন সেই চেষ্টাও আছে। নানান জায়গায় লেখালেখি করছেন। একটা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালো ভাব আছে। খুব বড়লোকের মেয়ে। গাড়ি করে এ বাড়িতে আসে। এই গাড়িও মেয়ে নিজেই চালায়। মেয়েটার নাম শ্রাবণী। মেজোভাই ডাকেন বনী বলে। খুব মিষ্টি করে ডাকেন। কাউকে যে এত মিষ্টি করে ডাকা যায় তা আমার ধারণায় ছিল না। মেয়েটা দেখতে বিশেষ ভালো না। চেহারায় কেমন পুরুষ পুরুষ ভাব। এই মেয়ে ছাড়াও আরো একটি মেয়ে মেজোভাইয়ের কাছে আসে। সেই মেয়েটা দেখতে খুবই সুন্দর। তবে গরিব ঘরের মেয়ে। বেশির ভাগ সময়ই সে হেঁটে হেঁটে আসে। তার নাম শোভা। মেজোভাই তাকে ডাকেন 'শু' বলে। এই মেয়ে বাসায় এলে মেজোভাইয়ের মুখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখায়। মেয়েটি চলে যাবার সময় মেজোভাই তাকে এগিয়ে দেবার জন্য অনেক দূর যান। হয়তো বাসে তুলে দেন কিংবা রিকশা ঠিক করে দেন। মেজোভাইয়ের মুখের উজ্জ্বল ভাব মেয়েটি চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ থাকে। তবু আমার কেন জানি মনে হয় মেজোভাই বড়লোকের মেয়েটাকেই বিয়ে করবেন। কারণ খাবার টেবিলে একদিন কথায় কথায় বললেন, বাংলাদেশের কিছু কিছু মানুষের অসম্ভব পয়সা হয়েছে। শ্রাবণী বলে যে একটা মেয়ে আমার কাছে আসে ওরা তিন বোন। তিনজনের নামেই গুলশানে আলাদা আলাদা বাড়ি আছে। তিনজনের আলাদা আলাদা গাড়ি। Can you believe it? কথাগুলি বলার মসয় মেজোভাইয়ের মুখ ঝলমল করতে লাগল। চোখে ঘোর ঘোর ভাব চলে এল। মনে হল তিনি কল্পনায় গুলশানের বাড়ি এবং বাড়ির সামনে কালো রঙের মারস মাইনর গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন।

আমার সবচে' ছোট বোনের নাম নীতু। নীতু এবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার কারণেই বোধহয় নিজেকে সে বেশ বড় বড় ভাবছে। যদিও সে এখনো পুরোপুরি ছেলেমানুষ। ব্যসায় সারাক্ষণ আচার খায়। শিবরামের বই পড়ে হি হি করে হাসে। টিভির অতি অখাদ্য নাটকও গভীর আগ্রহে দেখে। করুণ রসের দু'একটা ডায়ালগ শুনলেই তার চোখ ছলছল করে ওঠে। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে সে নিজের জন্য একা একটা ঘর নিয়েছে। প্রতি রাতেই নিজের ঘরে ঘুমুতে যায়। একবার ঘুম ভাঙলেই ভয় পেয়ে মার ঘরে চলে আসে। ছোটবেলায় নীতুকে রাগানোর একটা বুদ্ধি ছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে বলা—নীতু, আয় আয় তু-তু-তু। নীতুর স্কুল-জীবনের বন্ধুরা এখনো তাকে এইভাবে ক্ষেপায়। নীতু হচ্ছে আমাদের পরিবারের সবার আদরের মেয়ে এবং হয়তোবা সবচে' ভালো মেয়ে। উঁহু, ঠিক হল না। সবচে' ভালো আমাদের বুনোভাই। মা যাকে অজগর সাপ বলেন।

সব ভাইবোন সম্পর্কেই বললাম, এবার বোধহয় নিজের কথা কিছু বলা দরকার। মুশকিল হচ্ছে, আমার নিজের প্রসঙ্গে বলার মতো কিছু নেই। তাছাড়া বলতে ইচ্ছে করছে না। বরং মার কথা বলি।

মা এককালে খুব রূপবতী ছিলেন। তাঁর তরুণী বয়সের একটি ছবি আছে। সেই ছবির

দিকে তাকালে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। আজকের মোটাসোটা, চুল-পাকা মার সঙ্গে ঐ ছিপছিপে তরুণীর কোনো মিল নেই। ছবিতে মার মুখে এক ধরনের দুষ্টু হাসি। চোখ দুটিতে অন্য ভুবনের রহস্যময়তা। একবার ছবির সামনে দাঁড়ালে চট করে সরে যাওয়া যায় না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। মা খুব রাগারাগি করেন এটা তো বলেছি। তবে সবার সঙ্গে না। তাঁর রাগের মূল টার্গেট বুনোভাই। দ্বিতীয় টার্গেট নীতু। বড় ভাইয়ের উপর রাগ করার তা-ও একটা অর্থ হয়, নীতুর উপর রাগের আমি কোনো কারণ খুঁজে পাই না। অনেক মানুষের সামনে নীতুকে অপমান করতে পারলে তিনি যেন কেমন আনন্দ পান। আবার একই সঙ্গে নীতুর সামান্য অসুখ-বিসুখে অস্থির হয়ে যান। অবশ্যি বড় আপার সঙ্গে মার খুবই খাতির। দুজন পান খেতে খেতে বান্ধবীর মতো গল্প করেন। গল্পের এক পর্যায়ে একজন অন্য জনের গায়ে ধাক্কা দেন। দেখতে খুব ভালো লাগে।

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা হল না। দোতলা বাড়ির কথা এক ফাঁকে বলেছি, নীতুর আলাদা ঘরের কথা বলেছি। এর থেকে ধারণা হওয়া বিচিত্র না যে, আমরা বেশ মালদার পার্টি। আসলে তা না। সাধু ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—ইহা সত্য নহে। আমরা মোটেই মালদার পার্টি নই। খুবই দুর্বল পার্টি। আশপাশে কেউ তা জানে না। তারা দেখে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চমৎকার একটা দোতলা বাড়ি। লাল রঙের বাগানবিলাসের পাতা যখন বাড়িক ঢেকে ফেলে তখন এই বাড়িকে স্বপ্নের বাড়ি বলে মনে হয়। এই বাড়িতে যারা থাকে তাদের দুর্বল পার্টি মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

কাউকে বাড়ির ঠিকানা দেবার সময় আমরা বলি, রাস্তার ডান দিকে মোড় নিলেই দেখবেন চমৎকার একটি শাদা বাড়ি। বাগানবিলাসে ছাওয়া। আমাদের বাড়ির কথা বলতে গেলে 'চমৎকার' বিশেষণ আপনা আপনি চলে আসে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে—এই বাড়ি কিন্তু আমাদের না। আমরা এই বাড়ির কেয়ারটেকার, আসল মালিক হলেন মইনুদ্দিন চাচা—বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁর দুজন একই সঙ্গে বি. এ. পাস করেন। বাবা ধরাধরি করে চাকরি পেয়ে যান, মইনুদ্দিন চাচা পান না। তিনি ইন্টারভ্যুর পর ইন্টারভ্যু দিতে থাকেন। তাঁর খুবই খারাপ সময় যেতে থাকে। বাবা তখন মোটামুটি সব গুছিয়ে ফেলেছেন। বিয়েও করেছেন। ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন। গোছানো ছিমছাম সংসার।

মইনুদ্দিন চাচার কিছু হচ্ছে না। বাবার সঙ্গে থাকেন। বসার ঘরে সোফায় রাতে ঘুমান, সারাদিন চাকরির চেষ্টা করেন। কিছু হয় না। শেষে কী একটা ব্যবসা শুরু করলেন। ব্যবসা ঠিক না। দালালি ধরনের কাজ, যাতে ক্যাপিটেল লাগে না। এতেই তাঁর কপাল খুলে গেল। হু-হু করে পয়সা আসতে লাগল। দালালি ছেড়ে নানান ধরনের ব্যবসা শুরু করলেন। কয়েকটা মার খেল। কয়েকটা দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ি করলেন। তারপর চলে গেলেন ইংল্যান্ড। ঐখানে ব্যবসার চেষ্টা দেখবেন, তাছাড়া দেশে বোধহয় ব্যবসা-সংক্রান্ত তাঁর কিছু জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ি চলে এল আমাদের হাতে। ঠিক হল আমরা থাকব, বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করব।

বাবা বললেন, এক শর্তে থাকব—ভাড়া নিতে হবে। যত ভাড়া হওয়া উচিত তা তো দিতে পারব না। যা পারি আলাদা একটা একাউন্ট করে জমা রাখব।

মইনুদ্দিন চাচা বললেন, বেশ। কিছু কিছু টাকা আলাদা একাউন্টে রাখ। ছোটখাটো

রিপিয়ারিঙের কাজ এই টাকায় করবে। আমার কোনো আপত্তি নেই। বাড়ি আমি অন্যের হাতে দিতে চাই না। বাড়ির পেছনে তোমরা খরচপাতি করতে চাও করবে।

আমরা কোনো খরচপাতিই করলাম না। মইনুদ্দিন চাচার একাউন্টে এক পয়সাও জমা পড়ল না। আমরা অন্যের বাড়িতে দিব্যি থাকি। খাই, দাই, ঘুমাই। প্রতি মাসে বাড়িভাড়ার টাকাটা বেঁচে যায়।

শুধু তাই না, বাবা চিঠি লিখে মইনুদ্দিন চাচার কাছ থেকে মাঝে মাঝে টাকা আনান। যেমন একবার লিখলেন—দোতলার ছাদে দুটা ঘর করে রাখলে বেশ ভালো হয় এবং ছাদের চারদিকে রেলিং দেয়া দরকার। বাচ্চারা ছাদে যায়। মইনুদ্দিন চাচা তার জন্যে আলাদা করে টাকা পাঠালেন। পানির পাম্পের জন্যে লেখা হল। তার জন্যেও টাকা চলে এল। কিছু মাটি দিয়ে উঠোনটা উঁচু করা দরকার। ছটাক মাটি হলেই হবে। মইনুদ্দিন চাচা সেই টাকাও পাঠান। এইসব টাকার কোনোটাই বাবা কাজে লাগালেন না। ঘর উঠল না। রেলিং হল না। পানির পাম্প কেনা হল না। মইনুদ্দিন চাচা বাড়ির পেছনে দুটা ঘর করার জন্যেও টাকা পাঠালেন। ঐ ঘরে ড্রাইভার, মালী, দারোয়ান ওরা থাকবে। তিনি এই সঙ্গে ইংরেজিতে একটি চিঠি লিখলেন যার বিষয়বস্তু আগামী বছরের মাঝামাঝি তিনি দেশে আসবেন। কতদূর কী হল দেখবেন। অথচ কিছুই করা হয় নি। শেষবার পাঠানো টাকা বাবা একটা ব্যবসায় খাটিয়েছিলেন। সেখান থেকে একটা পয়সা আসে নি। আমও গেছে, ছালাও গেছে।

এখন বাবার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। আগে স্বাস্থ্যবিধি পালনে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ করতেন, সেই প্রাতঃভ্রমণ আপাতত বন্ধ। অফিস থেকে এসে ঝিম মেরে বসে থাকেন। কলিংবেল বাজলে দারুণ চমকে ওঠেন। বোধহয় ভাবেন—মইনুদ্দিন চাচা চলে এসেছেন। যখন দেখা যায়, না, মইনুদ্দিন চাচা না অন্য কেউ, তখন বাবার চোখে আনন্দের একটা আভা খেলে যায়। আমার বড় মায়া লাগে। কয়েক দিন আগে সবাইকে ডেকে একটা মিটিঙের মতো করলেন শুকনো মুখে বললেন, মইনুদ্দিন চলে আসছে। একটা কিছু তো করতে হয়। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। কম ভাড়ায় একটা বাসা খোঁজা দরকার। তোমাদের বিষয়টা বলতে আমি কোনো অসুবিধা দেখছি না। বলাই উচিত—আমি এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। Total darkness.

বাবা মার দিকে তাকালেন। এমনিতে মার কথার যন্ত্রণাতে থাকতে পারি না। আজ তাঁর মুখেও কথা নেই। তিনিও সম্ভবত চোখে অন্ধকার দেখছেন।

আমার নিজের বেশ মন খারাপ হল। এই চমৎকার শাদা বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আবার দুই রুমের ফ্ল্যাটে উঠতে হবে। থাকব কী করে? দম বন্ধ হয়ে আসবে।

মেজোভাই বললেন, 'উনি বেড়াতে আসছেন। বাড়ির দখল নেয়ার জন্যে তো আসছেন না। কাজেই আমরা এখন যেমন আছি, পরেও থাকব। আমি তো কোনো সমস্যা দেখছি না।'

বাবা শুকনো মুখে বললেন, 'কিন্তু সে যখন দেখবে কাজ-টাজ কিছুই হয় নি। তখন...

মেজোভাই বললেন, 'তখন আবার কী? রাগারাগি-হৈচই করবে। তাই বলে তো বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না? এভিকশন এত সহজ না, খুব কঠিন।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'জোর করে অন্যের বাড়িতে থাকব নাকি?'

'দরকার হলে থাকতে হবে।'

'থানা-পুলিশ করবে। বিশ্রী ব্যাপার।'

'থানা-পুলিশ করলে আমরাও থানা-পুলিশ করব। থানা-পুলিশ কি উনার একার নাকি? আমাদের রাইট অব পজেশন আছে না? আইন আমাদের পক্ষে।'

বুনোভাই এই পর্যায়ে বললেন, 'তোর কথাবার্তা তো আমি কিছুই বুঝছি না। বেচারা এতদিন থাকতে দিয়েছে, থেকেছি। এখন চলে যেতে বললে চলে যাব না? এ কেমন কথা?'

'যাবে কোথায় তুমি?'

'যেখানেই হোক যেতে হবে। আমার তো মনে হয় যে টাকাটা ভদ্রলোক পাঠিয়েছিলেন সেটা যোগাড় করে রাখলে...মানে উনাকে টাকাটা দিয়ে যদি বলা হয়....'

মেজোভাই তিক্ত গলায় বললেন, 'টাকাটা থাকতে হবে তো? বাবা, তোমার কাছে কি টাকা আছে?'

বাবা জবাব দিলেন না। সেই সময় হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। দেখা গেল বাবা নিদারুণ চমকে উঠেছেন। না, মইনুদ্দিন চাচা না—শ্রাবণী এসেছে। মেজোভাই মিটিং ফেলে উঠে গেলেন।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বললেন, 'রঞ্জু, কী করা যায় বল তো?'

আমি পরিবেশ সহজ করার জন্যে হালকা গলায় বললাম, চল, আমরা সবাই মিলে আলাদীনের চেরাগের সন্ধানে বের হই। রসিকতা হিসেবে এটা যে খুব উচ্চমানের তা না। তবে নীতু হেসে ভেঙে পড়ল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে অনেক কষ্টে বলল, ভাইয়া যা হাসাতে পারে। বাবা বেশ কয়েকবার কঠিন দৃষ্টিতে নীতুর দিকে তাকালেন । নীতুর হাসি বন্ধ হল না।

মা উঠে এসে আমাদের সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন নীতুর গালে। নীতু বড় অবাক হল, তবে সম্ভবত পারিস্থিতির গুরুত্ব খানিকটা বুঝল। কারণ কেঁদে ফেলল না বা উঠে চলেও গেল না। শুকনো মুখে বসে রইল।

যাই হোক, বাবার এবং সেই সঙ্গে আমাদের সবার সমস্যার সমাধান হঠাৎ করেই হয়ে গেল। মইনুদ্দিন চাচার মেয়ের এক রেজিস্টার্ড চিঠি এসে পড়ল। ইংরেজিতে লেখা চিঠি, যার সরল বাংলা—আমার আব্বার শরীর ভালো না। হঠাৎ খুব খারাপ করেছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা নিয়ে যাচ্ছি। কাজেই এখন তিনি আর দেশে যেতে পারছেন না। বাবা আপনাদের তাঁর জন্যে দোয়া করতে বলেছেন। দয়া করে দোয়া করবেন।

ইতি—তানিয়া।

তানিয়া মইনুদ্দিন চাচার বড় মেয়ে। বয়সে নীতুর তিন বছরের ছোট। মইনুদ্দিন চাচা বিয়ে করেন অনেক দেরিতে। নীতুর জন্মেরও বছরখানেক পর। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ আসতেন, তখন তাঁকে অন্য বাড়ির লোক মনে হত। তিনি থাকতেন চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়িতে। যে বাড়ির ভাড়া সাত হাজার টাকা। দারোয়ান আছে, মালী আছে। চারটা বাথরুমের তিনটাতেই বাথটাব। হুলস্থুল কাণ্ড। আমরা বেশ কয়েকবার ঐ বাড়িতে গিয়েছি, কখনো স্বস্তি বোধ করি নি। ঐ বাড়িতে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। ওরা এত বড়লোক,

আমরা এত গরিব! মইনুদ্দিন চাচা এক সময় দরিদ্র ছিলেন এবং বাবার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন—এটা বিশ্বাস করতেই আমার কষ্ট হত। বাবা যখন তাঁর সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলতেন তখন আমার ভয় ভয় করত। মনে হত বাবা খুব একটা ভুল কাজ করছেন। এই ভুলের জন্য সবার সামনে বকা খাবেন।

তানিয়া এবং তার ছোট বোন মুনিয়াও বেশ কয়েকবার আমাদের বাসায় এসেছে। মেয়ে দুটির চেহারা ভালো না, তবে সব সময় সেজেগুজে থাকত বলে দেখতে ভালো লাগত। এই দুই মেয়ে আমাদের বাসায় এলে কখনো কথা বলত না। গম্ভীর মুখে বসে থাকত। নীতু একবার তানিয়াকে হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তানিয়া বিরক্ত গলায় বলেছিল, প্লিজ, আমার হাত ধরে টানাটানি করবেন না। কেউ গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না। এই কথায় নীতু খুবই অপমানিত বোধ করে। সে তখন ক্লাস টেনে পড়ে—অপমানিত বোধ করারই বয়স। সেই বছরই মইনুদ্দিন চাচা ইংল্যান্ডে চলে যান এবং আমরা তাঁদের নতুন বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে উঠে আসি।

নীতু কিছুতেই এই বাড়িতে উঠতে রাজি ছিল না। বার বার ঘাড় গোঁজ করে বলছিল, আমরা কেন ওদের বাড়িতে থাকব? আমরা কি পাহারাদার যে উনার বাড়ি পাহারা দেব? আমি কিছুতেই ঐ বাড়িতে যাব না। মরে গেলেও না। ওটা তানিয়াদের বাড়ি। ঐ হিংসুটে মেয়ের বাড়িতে আমি থাকব না। না-না-না।

মজার ব্যাপার, মইনুদ্দিন চাচার ঐ হিংসুটে মেয়ের চিঠি পড়ে আমাদের বাসায় শান্তি ফিরে এল। বাবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। যদিও সেই চিঠি পড়ে বন্ধুর অসুখের কথা ভেবে তাঁর বিষাদগ্রস্ত হবার কথা ছিল। তিনি তেমন বিষাদগ্রস্ত হতে পারলেন না। তবু মুখ যথাসম্ভব করুণ করে বললেন, আহা, কী অসুখ হল বল তো? অসুখ সম্পর্কে যখন কিছু লেখে নি তখন তো মনে হচ্ছে মারাত্মক কিছু। ক্যানসার না তো? ক্যানসার হলে আমি তো কোনো আশা দেখি না। ভেরি স্যাড। ক্যানসার হ্যাজ নো আনসার।

মা বললেন, বড় কিছুই হবে নয়তো কি আর চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা গেছে।

বাবা বললেন, দ্যাটস ট্রু। তাছাড়া ও নিজে চিঠি পর্যন্ত লেখে নি। সবার কাছে দোয়া চাচ্ছে—উফ! আমি তো সহ্য করতে পারছি না।

মা বললেন, তুমি মৌলানা সাহেবকে ডেকে একটা মিলাদের ব্যবস্থা কর।

মা জিতু মিয়াকে দিয়ে মুরগি আনিয়ে ছদগা দিলেন। বাসায় একদিন মিলাদও হল। একজন উটকো ধরনের মওলানা এসে নবী-এ করিমের জীবনের যাবতীয় ঘটনা পুরো দু ঘন্টা লাগিয়ে বর্ণনা করলেন। এত বিরক্ত লাগছিল যে বলার না। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করা যায় না বলে মুখ বুজে সহ্য করেছি।

এক মাস পর আমেরিকা থেকে মইনুদ্দিন চাচার মৃত্যুসংবাদ এল। তাঁর যকৃতে ক্যানসার হয়েছিল। সিরোসিস অব লিভার। বাবা খানিকক্ষণ কাঁদলেন, হয়তো আন্তরিকভাবেই তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ মইনুদ্দিন চাচা তাঁর একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁদের দুজনের নিশ্চয়ই অনেক সুখস্মৃতি আছে। সবচে' বেশি কাঁদল নীতু। সে কাঁদতে কাঁদতে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলল--কারণ মইনুদ্দিন চাচা নীতুকে খুবই আদর করতেন। নীতু যখন ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ত তখন মইনুদ্দিন চাচা তাকে প্রায় স্কুল থেকে নিয়ে গাড়িতে করে ঘুরতেন। তিনি তখন নতুন গাড়ি কিনেছেন, নীতুর এই গাড়ি খুব পছন্দ।

মইনুদ্দিন চাচা প্রায়ই নীতুকে বলতেন, মা, তোর গাড়ি এত পছন্দ, তোকে আমি তোর বিয়ের সময় একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করব। তোকে কথা দিলাম রে মা। নীতু কচি কচি গলায় বলত, 'আপনি ভুলে যাবেন না তো চাচা?'

'না, ভুলব না। আমি কিছুই ভুলি না রে মা। আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।'

বিয়েতে সে গাড়ি পাবে না এই শোকে নীতু নিশ্চয়ই কাঁদে নি—তার দুঃখে কোনো খাদ ছিল না। মইনুদ্দিন চাচা তাকে যেমন পছন্দ করতেন সেও তাঁকে তেমনি পছন্দ করত। আমরা তাঁর মৃত্যুতে সত্যিকার অর্থে ব্যথিত হলাম। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার দুমাস পর যখন তাঁর মেয়ে আমেরিকা থেকে জানাল—তার বাবা মৃত্যুর সময় বলে দিয়েছেন ঢাকার যে বাড়িতে আমরা আছি—সেই বাড়িটা যেন আমরাই পাই এই ব্যবস্থা করতে। কীভাবে কী করতে হয় তা সে জানে না। তার মার শরীরও ভালো না। তারা দেশে এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করবে।

এই চিঠি পেয়ে সত্যিকার অর্থেই আমরা অভিভূত হলাম। মইনুদ্দিন চাচা তাঁর এক জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তার মানে এই না যে, তিনি আস্ত একটি বাড়ি ছেলেবেলার বন্ধুকে দিয়ে দেবেন। কেউ তা দেয় না। গল্প, উপন্যাস বা সিনেমায় হয়তো দেয়। বাস্তবে না।

শুরুতে আমি বলেছিলাম যে, এই বাড়ি আমাদের না, আমরা এই বাড়ির কেয়ারটেকার—এটা এখন আর প্রযোজ্য নয়। এ বাড়ির এখন আমরাই মালিক। দরিদ্র মধ্যবিত্ত এখন আর আমাদের বলা চলে না। আমরা ঢাকা শহরে আস্ত একটা দোতলা বাড়ির মালিক। কাগজপত্রও এখন আমাদের কাছে আছে। দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়েছে। আইনের কোনো ফাঁক নেই। আমার ইনজিনিয়ার মেজোভাই ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছে এই বাড়ি ভেঙে সাততলা একটি কমপ্লেক্স হবে। পুরো বাড়িটা হবে আরসিসির উপর। একতলায় থাকবে গ্যারেজ, শপিং, মল, লন্ড্রি। উপরে অ্যাপার্টমেন্ট। এই বিশাল কমপ্লেক্সের জন্যে বাড়তি কোনো ব্যাংক লোনেরও প্রয়োজন হবে না। কিছু কিছু অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে দিলেই টাকাটা উঠে আসবে। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বাড়ি। জমির দামই ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা। আমরা এক ধাক্কায় অনেক দূর উঠে গেলাম।

দূরে ওঠা মানুষদের কাছে পৃথিবী অনেক ছোট মনে হয়—আমাদেরও সে রকম মনে হওয়া উচিত ছিল। আমাদের সবারই আচার-আচরণ এবং মানসিকতা খানিকটা হলেও বদলানো উচিত। আশ্চর্যের ব্যাপার, তেমন বদলাল না। বড় ভাই আগের মতোই একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পা নাচাতে লাগলেন। মা সবার সঙ্গে সমানে ঝগড়া করে যেতে লাগলেন। নীতু নিজেকে তরুণী হিসেবে জাহির করার জন্যে আগের মতোই ব্যস্ত রইল। তবে কিছুটা পরিবর্তন যে হল না তা না। যেমন, হয়তো দেয়ালে পেরেক পুঁতছি, মা ছুটে এসে বললেন, এসব কী, দেয়াল জখম করছিস কেন? যেন এই বাড়ি এখন আর বাড়ি না—এটা এখন মানুষ। এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর দেয়াল জখম করলে এ ব্যথা পায়। অবশ্যি এই বাড়ি মেজোভাইকে বেশ খানিকটা বদলে দিল। একদিন দেখি গজ ফিতা নিয়ে জমি মাপামাপি হচ্ছে। সঙ্গে বিষণ্ণ চেহারার বুড়ো একজন মানুষ। আমি দোতলার জানালা থেকে দেখলাম, মেজোভাই হাত নেড়ে নেড়ে বুড়োকে কী যেন বলছেন। একদিন আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে তিনি একটা মিটিংও বসালেন। তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে মনে হল গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। দরজা ভিড়িয়ে দিলেন। তাঁর গলার স্বর নিচে নেমে গেল। বুনোভাই পা নাচানো বন্ধ করে বিস্মিত স্বরে বললেন, 'তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন? তোর কী হয়েছে? এনিথিং রং?'

মেজোভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কিছু হয় নি। আমি কী বলতে চাচ্ছি দয়া করে মন দিয়ে শোন। এই যে প্রপার্টি আমরা পেয়েছি এর ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে তোমার কী ভাবছ সেটা প্রথমে আমি জানতে চাই। তারপর আমার কিছু কথা আছে, যা আমি বলতে চাই। বুনোভাই প্রথমে তুমি বল।'

বুনোভাই উঠে বসতে বসতে বললেন, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা একটা ফরম্যাল মিটিং করছি। যদি তাই হয় তাহলে একজন সভাপতি ঠিক করা দরকার। কে হবে সভাপতি? আমি তোর নাম প্রস্তাব করতে পারি করব?' মেজোভাই রাগী স্বরে বললেন, আজেবাজে কথা বলার আমি কোনো অর্থ দেখছি না। লেট আস ডিসকাস।

বুনোভাই বললেন, 'ডিসকাস করার আমি তো কিছু দেখছি না। মইনুদ্দিন চাচার মেয়ের কাছ থেকে এই বাড়ি নেয়াই আমাদের উচিত হয় নি। কাজটা ভুল হয়েছে।'

'কেন?'

'চাচা যা করেছেন, ঝোঁকের মাথায় করেছেন। তাঁর যদি ক্যানসার না হত, মৃত্যু যদি তাঁর সামনে এসে না দাঁড়াত তাহলে তিনি এই কাজ করতেন না. তিনি ঠিকই বাড়ি দেখতে আসতেন এবং বাড়ির কোনো কাজ হয় নি দেখে বাবার সঙ্গে রাগারাগি করতেন। হয়তো আমাদের বেরও করে দিতেন। মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখে বেচারার সব এলোমেলো হয়ে গেল। তাঁর এই দান গ্রহণযোগ্য নয়।'

মেজোভাই হতভম্ব গলায় বললেন, 'এই সব তুমি কী বলছ?'

'সত্যি কথা বলছি। পাগল অবস্থায় কেউ উইল করলে সেই উইল গ্রাহ্য হয় না। তিনি পাগল অবস্থায় বাড়ি দান করেছেন। এই দানও গ্রাহ্য নয়।'

'উনি পাগল ছিলেন তোমাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নি—আমি অনুমান করতে পারি। পাগল মানে কী? পাগল হচ্ছে সেই মানুষ যার পক্ষে ব্যাশনালি চিন্তা করা যে কোনো কারণেই হোক সম্ভব না।'

'তুমি তাহলে কী করতে বল?'

'আমি ভাবছি বাবাকে বলব—বাড়িটা ঐ মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে। ঐ মেয়ের হাতেও খুব টাকা-পয়সা আছে বলে মনে হল না। আমার ধারণা জমানো সব টাকা বাবার চিকিৎসায় খরচ করে ফেলেছে। ঢাকায় মইনুদ্দিন চাচা আর কোনো বাড়িও করেন নি। কাজেই আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে মেয়েকে বলা—দেখ তানিয়া, তোমার বাবা মৃত্যুর আগে একটা কথা বলেছেন। সেই কথা নিয়ে তুমি ছোটাছুটি করছ, এই কথার কোনো মানেই নেই। এই বাড়ি তোমার। তুমি দয়া করে ফেরত নাও।'

'চুপ কর তো।'

'আমি তো চুপ করেই ছিলাম। তুই কথা বলতে বললি বলেই কথা বলছি। আমার এত কী দায় পড়েছে? তবে ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছি।'

'তোমাকে এত চিন্তা করতে কেউ বলে নি। তুমি দয়া করে অজগর সাপের মতো শুয়ে থাক, আর পা নাচাও।'

'তুই এত রেগে আছিস কেন?'

'রেগে আছি কারণ তোমার মধ্যে কোনো ড্রাইভ নেই। উন্নতি করার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি চাচ্ছি আমরা তিন ভাই মিলে একটা লিমিটেড কোম্পানি খুলে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিঙের প্রজেক্ট হাতে নেব। আর তুমি উল্টাপাল্টা কথা শুরু করলে। যেন বিরাট ফিলসফার।'

বড় ভাই শান্ত গলায় বললেন, 'অন্যের জায়গার উপর তুই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করবি? তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল?'

'অন্যের জায়গা হবে কেন?'

'অবশ্যই অন্যের জায়গা। আগেই তো বললাম মইনুদ্দিন চাচার এই বাড়ি আমাদের দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। পুরো ব্যাপারটা একজন অসুস্থ মানুষের ঝোঁকে ঘটে গেছে।'

'তুমি এত বেশি বেশি বোঝ বলেই তো তোমার আজ এই অবস্থা!'

'কী অবস্থা?'

'দিনরাত বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে হয়।'

বুনোভাই হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ফাইন্যাল পরীক্ষা সামনে। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। দিনরাত বাড়ি, প্রপার্টি, ডেভেলপমেন্ট মাথায় ঘুরলে তো তুই ফেল করবি।'

'আমার পরীক্ষা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি তো আর অসুস্থ না, আমি সুস্থ। আমি আমার নিজের ভালোমন্দ বুঝি।'

মেজোভাই মুখ লাল করে ঘরে থেকে বের হয়ে গেলেন। বুনোভাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'রঞ্জু, তুই বোস।'

আমি বসলাম।

তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'মইনুদ্দিন চাচার মেয়েটাকে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটাকে তোর কেমন লাগল?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো?'

'দেখতেও মন্দ না।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু তো মনে পড়ছে না।'

বুনোভাই উঠে বসলেন। তাঁর চোখে-মুখে কৌতূহল এবং আগ্রহ। চাপা গলায় বললেন, 'খুব স্পিরিটেড মেয়ে। আমার মেয়েটাকে খুব পছন্দ হয়েছে। মইনুদ্দিন চাচা মেয়েটাকে মরবার সময় একটা অন্যায় কথা বলেছেন—মেয়ে অক্ষরে অক্ষরে সেই কথা পালন করেছে। তার আত্মীয়স্বজনরা নিশ্চয়ই অনেক বাধা দিয়েছে, এই মেয়ে কিছুই শোনে নি। ভুল বললাম নাকি, রঞ্জু?'

'না, ভুল বল নি।'

'একটা জিনিস লক্ষ করেছিস—মেয়েটা তার বাবার কথা, অসুখের কথা, মৃত্যুর কথা আমাদের ইলাবরেটলি বলল। বলতে গিয়ে একবারও কাঁদল না। আমি এই জিনিসটা খুব অবাক হয়ে লক্ষ করলাম। তুই লক্ষ করেছিস?'

'হুঁ।'

'আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার লক্ষ করলাম—শুরুতে মেয়েটিকে আমার মোটেই আকর্ষণীয় মনে হয় নি—চলে যাবার সময় মনে হল, বাহ্, মেয়েটা দেখতে ভালো তো!'

তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হাতে দুদিন আগের পত্রিকা। এটা হচ্ছে তাঁর

সিগন্যাল। কথা শেষ হয়েছে—এখন চলে যাও। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, 'বুনোভাই।' তিনি মুখের উপর থেকে পত্রিকা না নামিয়েই বললেন, 'বলে ফেল।'

'তুমি যে জীবনটা শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিচ্ছ তোমার খারাপ লাগে না?'

'না। পৃথিবীতে প্রচুর লোক আছে যারা দিনরাত পরিশ্রম করে—অল্প কিছু আছে যারা কিছুই করে না। আমি সেই অল্পের দলে। মাইনরিটি হবার যন্ত্রণা যেমন আছে, আনন্দও আছে।'

'এ রকম কতদিন থাকবে?'

'বেশিদিন থাকব না। একদিন দেখবি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছি। চাকরি-বাকরি করছি।'

বুনোভাই আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন, যেন আমাকে আশ্বস্ত করতে চান। আমি বললাম, 'বুনোভাই যাই।'

'যা। বাবার দিকে লক্ষ রাখিস।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কার দিকে লক্ষ রাখব?'

'বাবার দিকে লক্ষ রাখবি। আমার মনে হচ্ছে বাবার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে।'

বুনোভাই মুখের উপর থেকে পত্রিকা নামিয়ে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এমনি বললাম—তোকে ভয় দেখালাম।

বুনোভাইয়ের কথা আমি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলাম না। বাবার দিকে খানিকটা লক্ষ রাখলাম। তেমন কিছু চোখে পড়ল না, সহজ স্বাভাবিক মানুষ। তবে বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গাটায় বেশির ভাগ সময় কাটাতে দেখা গেল। একদিন এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'এখানে কী করছ?' তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু না, কিছু না, বসে আছি।'

'রোদে বসে আছ যে?'

'এমনি। দাঁতে ব্যথা—এই জন্যে।'

'দাঁতে ব্যথা হলে কেউ রোদে বসে থাকে? চল ডাক্তারের কাছে যাই।'

'বাদ দে।'

'বাদ দেব কেন, চল যাই।'

সেদিন বিকেলেই ডেনটিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম। ডেনটিস্ট প্রথম দিনেই দুটা দাঁত টেনে তুলে ফেলল। সাধারণত ডেনটিস্টরা তা করে না, প্রথমে কিছু ওষুধপত্র দেয়। মনে হয় এই ডেনটিস্টের ধৈর্য কম।

রিকশায় করে ফেরার পথে তাকিয়ে দেখি বাবার গাল ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

'বাবা, ব্যথা করছে?'

'হুঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি তো ব্যথা শুরু হবার কথা না।'

বাবা নিচু গলায় বললেন, 'শরীরের ব্যথা কিছুই না। শরীরের ব্যথার জন্যে ওষুধপত্র আছে। ডাক্তার-কবিরাজ আছে। মনের ব্যথার কিছুই নেই।'

'কিছু নেই তাও ঠিক না, বাবা। মনের অসুখের ডাক্তারও আছে।'

'অসুখের কথা তো বলছি না। মনের ব্যথার কথা হচ্ছে। মনের অসুখ আর মনের ব্যথা দুটা দুই জিনিস।'

'তোমার মনে কোনো ব্যথা আছে?'

'থাকবে না কেন? আছে। সবার মনেই অল্পবিস্তর আছে। আমারও আছে।'

'কী নিয়ে ব্যথা?'

'এই যে মইনুদ্দিনের বাড়ি নিয়ে এত বড় অন্যায় কাজটা করলাম। বেচারার কাছ থেকে টাকা-পয়সা এনে খরচ করে ফেললাম। রেলিং দিলাম না, ছাদে ঘর করলাম না। দারোয়ান আর মালীর ঘরটাও হল না।'

'উনি তো আর সেই খবর পান নি।'

'যখন বেঁচে ছিল তখন পায় নি। এখন পাচ্ছে। মৃত মানুষ সব জায়গায় যেতে পারে। সবকিছু দেখতে পারে। সে তো এখন সব কিছুই দেখছে। এই যে আমরা রিকশা করে যাচ্ছি হয়তো সেও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।'

বাবা চুপ করে গেলেন।

বুনোভাইয়ের কথা মনে হচ্ছে পুরোপুরি ভুল না। বাবার মনের মধ্যে কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আমরা যারা তাঁর চারদিকে ঘোরাঘুরি করছি তাদের কারো চোখে পড়ছে না। আর যে লোকটি দরজা বন্ধ করে সারাক্ষণ পা নাচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সে সব জেনে বসে আছে, আশ্চর্য তো!

আমি এবং মেজোভাই এক সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি। নীতু এসে ডাকল, 'ভাইয়া'। আমরা দুজন একসঙ্গে বললাম, 'কী?'

নীতু আমাদের দুজনকেই ভাইয়া ডাকে। আমরা দুজন এক সঙ্গে থাকলে খুব মুশকিল হয়। ভাইয়া ডাকলে একসঙ্গে বলি, কী। নীতু হেসে গড়িয়ে পড়ে। আজ হাসল না। মুখ কালো করে বলল—'বাবা যেন কী রকম করছেন।' আমরা ছুটে গেলাম। বাবা দিব্যি ভালো মানুষের মতো দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন। চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছেন। আমাদের হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

মেজোভাই বললেন, 'আপনার শরীর কেমন?'

আমরা সবাই বাবাকে তুমি করে বলি। মেজোভাইও বলেন। তবে তিনি কেন জানি মাঝে মাঝে 'আপনি' বলেন।

বাবা বললেন, 'আমি তো ভালোই আছি। দাঁতের ব্যথা এখন আর নেই।'

মেজোভাই বললেন, 'এখানে বসে কী করছেন?'

'বসে থেকে কী আর করা যায়! চশমার কাচ পরিষ্কার করছি। কেন বল তো?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'ইস্তিয়াক, তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

মেজোভাই বললেন, 'ভালোই হচ্ছে।'

'পরীক্ষা কবে?'

'এখনো দেরি আছে।'

'কত দেরি?'

'ধর মাসখানিক।'

'মাসখানিক আর দেরি কোথায়? ত্রিশ দিন। মাত্র সাত শ বিশ ঘন্টা। আর সময় নষ্ট করবি না। এখন খানিকটা কষ্ট করলে বাকি জীবন তার ফল ভোগ করবি।'

নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। বাবারা যেসব কথা ছেলেদের বলেন—সেই সব কথা। আমরা দুজন নিচে নেমে নীতুকে খুঁজে বের করলাম। মেজোভাই বিরক্তমুখে বললেন, 'সব সময় ফাজলামি করিস কেন?'

নীতু মুখ কালো করে বলল, 'ফাজলামি করব কেন? আমি ঘর পরিষ্কার করছি, বাবা আমাকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। ফিসফিস করে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে। মইনুদ্দিন বসার ঘরে বসে আছে। আমি কোন লজ্জায় তার সামনে পড়ব বল? তুই তোর মাকে নিয়ে যা। বল্ যে আমরা এই বাড়ি ছেড়ে দেব। টাকা-পয়সা যা নিয়েছি সব তো আর

একসঙ্গে দিতে পারব না, বাই ইন্সটলমেন্ট দিয়ে দেব। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি বাসায় নেই। বলবি আমি দেশের বাড়ি গিয়েছি। যা, তাড়াতাড়ি যা। তোর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।'

মেজোভাই বললেন, 'তুই এসব বসে বসে বানিয়েছিস। বাবা কখনো এরকম কিছু বলে নি।'

নীতু রেগে গিয়ে বলল, 'আমি শুধু শুধু আজেবাজে কথা বানাতে যাব কেন? বাবাকে পাগল বানিয়ে আমার লাভ কী?'

'লাভ-ক্ষতি জানি না। তুই কথা একটু বেশি বলিস। কথা দয়া করে কম বলবি।'

'কথা তুমিও বেশি বল। তুমিও দয়া করে কথা কম বলবে।'

'আমি কথা বেশি বলি?'

'হ্যাঁ, বেশি বল। বড় আপাকে কী নাকি বলেছ—বড় আপা আজ চলে যাচ্ছে। বাচ্চাদের নিয়ে একা একা ফ্ল্যাটে থাকবে।'

'আমি তো কিছুই বলি নি।'

'অবশ্যই বলেছ।'

'কী বলেছি?'

'বলেছ, বসতবাড়ি মুসলিম আইনে মেয়েরা পায় না। পায় ছেলেরা। কাজেই এই বাড়ি তোমরা তিন ভাই পাবে। একটা লিমিটেড কোম্পানি হবে। সেই কোম্পানির সদস্য হবে শুধু ছেলেরা। একজনের কাছে থাকবে পাওয়ার অব এটর্নি, সে-ই কোম্পানি দেখাশোনা করবে। বল নি এসব কথা?'

'হ্যাঁ, বলেছি। তাতে অন্যায়টা কী হয়েছে? আইনে যা আছে তাই বলেছি।'

'এই আইন তোমাকে কে শিখিয়েছে? কোত্থেকে শিখলে এই আইন?'

'তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'তুমি যা শুরু করেছ না চেঁচিয়ে করব কী? একজন ভিক্ষা দিয়েছে সেই ভিক্ষা নিয়ে লাফালাফি শুরু করেছ। ভিক্ষা নিতে লজ্জা লাগে না?'

'চুপ কর তো!'

'না, চুপ করব না। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। তোমার বাড়াবাড়ি আমি ঘুচিয়ে দেব।'

'আমার বাড়াবাড়ি ঘুচিয়ে দিবি?'

'হ্যাঁ, দেব। এই বাড়ি আমি ফেরত দেয়াব। ঐ মেয়েকে দেয়াব। আর যদি ঐ মেয়ে নিতে না চায়—তাহলে কোনো একটা এতিমখানাকে কিংবা এই রকম কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার ব্যবস্থা করব। বাবাকে বললেই বাবা করবেন।'

'বাবা করে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ করবেন।'

'বাবার উপর তোর এত কনট্রোল আছে তা তো জানতাম না।'

'যখন খাঁচা থেকে পাখি উড়ে যাবে তখন জানবে। তার আগে জানবে না। আর তুমি কি ভেবেছ বাবাকে আমি বলি নি? বলেছি। বাবা কী বলেছেন জানতে চাও?'

মেজোভাই চুপ করে রইলেন।

নীতু সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করতে করতে বলল, 'বাবা আমাকে বলেছেন, তিনি

তাই করবেন।'

মেজোভাই নীতুর কথা ঠিক বিশ্বাস করলেন না, আবার পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেও পারলেন না। নীতু লোকজনকে ধাঁধায় ফেলার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে এটা যেমন সত্যি, আবার কঠিন সত্যি কথা অবলীলায় বলে এটাও সত্যি।

নীতু বলল, 'ভাইয়া, তোমার লোভ খুব বেশি। এত লোভ ভালো না। লোভ কমাও। নয়তো কষ্ট পাবে। এই বাড়িতে যখন এতিমখানা হবে কিংবা ফিরিয়ে দেয়া হবে তানিয়াকে, তখন বুনোভাইয়ের কিছুই হবে না। সে এখন যেমন আছে তখনো তেমনি থাকবে। কারণ তাঁর এই বাড়ির উপর কোনো লোভ নেই। মনের কষ্টে মারা যাবে তুমি। কারণ লোভে তোমার সর্বাঙ্গ জড়জড়।'

নীতু মেজোভাইকে স্তম্ভিত করে দোতলায় উঠে গেল। মেজোভাইকে দেখাচ্ছে বাজ-পড়া তালগাছের মতো। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব গলায় বললেন, 'নীতু কি পাগল হয়ে গেল নাকি? এসব কী বলছে? আমার তো মনে হয় ওর ব্রেইন পুরোপুরি ডাউন। ও পাগল হয়ে গেছে।'

'বুঝতে পারছি না। হয়তো হয়েছে।'

'বড় আপার কাণ্ডটা দেখ তো। ঠাট্টা করে কী না কী বলেছি, ওমনি আগুবাচ্চা নিয়ে রওনা হয়ে পড়েছে। এমন তো না যে তার টাকাপয়সা নেই—প্রচুর টাকা। চৌদ্দ লাখ টাকায় দুলাভাই ফ্ল্যাট কিনলেন। এছাড়াও দুলাভাইয়ের পৈতৃক বাড়িও আছে। তাঁকে বাদ দিয়ে লিমিটেড কোম্পানি খুললে তাঁর এত আপত্তি কেন?'

'ভাইয়া, ঐ প্রসঙ্গ থাক।'

মেজোভাই ইতস্তত করে বললেন, 'তুই যা তো—দেখ আপাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা যায় কিনা। আর নীতুকেও ঠাণ্ডা করতে হবে। আমাদের বোনগুলোর এমন মাথা গরম হল কেন বল তো? আমার ধারণা মাথা গরম ভাবটা এরা মার কাছে থেকে পেয়েছে।'

'হতে পারে।'

'ভাগ্যিস মা ঘরে নেই। মা থাকলে হইচই বাঁধিয়ে বিশ্রী কাণ্ড করত।'

'তা ঠিক।'

'মা কোথায় জানিস?'

'না। জিতু মিয়াকে নিয়ে যখন গেছে তখন মনে হয় কাঁচা বাজারে।'

'মা আসার আগেই ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা যায় কিনা একটু দেখ তো।'

'দেখছি।'

বড় আপাকে সামলানো খুব কঠিন হবে না। এর আগেও তিনি রাগ করে বাড়ি ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সুটকেসে কাপড় ভরেছেন, তারপর আবার রাগ পড়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়ই আপনাআপনি তাঁর রাগ পড়ে যায়। আজ তা হবে কিনা কে জানে। নির্ভর করছে মেজোভাই তাঁকে কতটা রাগিয়েছে তার উপর।

আমি বড় আপার ঘরের দিকে রওনা হলাম।

'আপা' আসব?'

বড় আপার চোখ ভেজা। তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'না।'

আমি ঘরে ঢুকলাম।

বড় আপা সুটকেসে কাপড় গুছাচ্ছেন।

রিমি এবং পলি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তাদের চোখও ভেজা। সম্ভবত মার খেয়েছে। চুপচাপ থাকলে মেয়ে দুটিকে পুতুলের মতো লাগে। আদর করতে ইচ্ছে হয়। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওরা জিভ বের করে আমাকে ভেংচি দিল। কেউ কাউকে শিখিয়ে দিল না। দু'জনই করল এক সঙ্গে। আশ্চর্য কো-অর্ডিনেশন।

বড় আপা বলল, 'কী বলবি বলে চলে যা। বিরক্ত করিস না।'

আমি খাটের উপর বসলাম। বড় আপাকে খুশি করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে মুখক কাঁচুমাচু করে তাঁর কাছে টাকা ধার চাওয়া। কেউ টাকা ধার চাইলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। মুখে অবশ্যি চূড়ান্ত অখুশির ভাব নিয়ে আসেন। একগাদা কথা বলেন—'তোরা আমাকে কী ভাবিস? আমি টাকার গাছ? আমাকে ঝাঁকি দিলেই হুড়হুড় করে টাকা পড়বে? ও আমাকে কোনো হাতখরচ দেয়? একটা পয়সা দেয় না। বাজার খরচ বাঁচিয়ে দু'একটা জমাই। তাও তোরা ধারের কথা বলে নিয়ে যাস। টাকার দরকার হলেই বড় আপার কথা মনে হয়। অন্য সময় তো মনে হয় না।'

একগাদা কথা বলবেন ঠিকই, বলতে বলতেই তাঁর মন ভালো হয়ে যাবে। খুশি খুশি মুখে টাকা বের করবেন।

আমি এই পদ্ধতি কাজে লাগাব বলে ঠিক করলাম। ইতস্তত করে বললাম, 'বড় আপা, একটা কথা বলতে চাচ্ছি, সাহসে কুলোচ্ছে না। তুমি রাগই কর কিনা। আজকাল তুমি আবার অল্পতেই রেগে যাও।'

'আমার আবার রাগ। আমার রাগে কার কী যায় আসে? আমি একটা মানুষ নাকি? কী ব্যাপার?'

'এলিফ্যান্ট রোডে একটা শার্ট দেখে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপা। মেরুন কালার।'

'পছন্দ হলে কিনে ফেল।'

'তুমি টাকা না দিলে কিনব কোত্থেকে? আমার কাছে কি টাকা-পয়সা আছে?'

'তোরা আমাকে ভাবিস কী? টাকার বস্তা?'

'হ্যাঁ।'

বড় আপা খুশি হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল। অনেক চেষ্টা করে তিনি মুখে বেজার ভাব নিয়ে এলেন।

'তোদের এই ধার চাওয়ার অভ্যাসটা গেল না। আমার কাছে কিছু হবে-টবে না। যা, বিরক্ত করিস না।'

'আপা, দিতেই হবে।'

'ধার, ধার আর ধার। কোনোদিন একটা পয়সা ফেরত দিয়েছিস?'

'এবারেরটা দেব। অনেস্ট। আপ অন গড। অবশ্যই ফেরত দেব।'

'আর দিবি! তোদের আমি চিনি না? হাড়ে হাড়ে চিনি। কত দাম শার্টের?'

'তিন শ।'

'মিথ্যা কথা বলছিস। ঠিক করে বল কত।'

'আড়াই শ।'

'আশ্চর্য তোদের স্বভাব। এর মধ্যেও ট্রিকস করে পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নেবার মতলব?'

'তিনশ চাচ্ছে আড়াই শতে দেবে।'

বড় আপা সুটকেস খুলে তিনটা একশ টাকার নোট বের করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এক্ষুনি পঞ্চাশ ফেরত দিয়ে যাবি। আমি কিন্তু বসে থাকব।'

'সুটকেস গুছাচ্ছিলে, ব্যাপার কী?'

'ভাবছিলাম ফ্ল্যাটে চলে যাব।'

'কেন?'

'ইস্তিয়াকের গায়ে চর্বি বেশি হয়েছে। আমাকে আইন দেখায়। মুসলিম আইনে বসতবাড়ি ভাগ হয় না। কে চায় তোর বসতবাড়ি? আমাকে এসব বলার অর্থ কী? আমি কি গাছতলায় আছি? চৌদ্দ লাখ টাকা নগদ গুনে ফ্ল্যাট কিনেছি। ব্যাংক থেকে একটা পয়সা নেই নি।'

'তা তো ঠিকই।'

'আমাকে অপমান করে আইন দেখায়। ভালো করে বল যে, আপা, এই বাড়িটা আমাদের তিন ভাইয়ের থাকুক। তোমার তো বাড়ি আছেই। তা না, ফ'রাজী আইন। আইনজ্ঞ এসেছেন।'

'ঠাশ করে গালে একটা চড় লাগালে না কেন?'

বড় আপা আরো খুশি হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি যদি লিমিটেড কোম্পানি হয় সবাইকে নিয়েই হবে, পাওয়ার অব এটর্নি থাকবে তোমার কাছে। কারণ তুমি সবার বড়।'

'এই সাধারণ কথা গাধাটার মাথায় ঢুকলে তো কাজই হত।'

বড় আপা মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন, 'তোরা এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'আমরা যাচ্ছি না মা?'

'না।'

মেয়ে দুটি এক সঙ্গে এমন প্রচণ্ড চিৎকার দিল যে ঘরের জানালা পর্যন্ত কেঁপে গেল। এরকম দুটি মেয়েকে বড় করতে আপার জীবন পানি হয়ে যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'যাই আপা।'

'যা। টাকাটা দিয়ে যাস কিন্তু।'

'দুই-একদিন পরে দেই আপা?'

বড় আপার খুশিখুশি ভাব আরো প্রবল হল। যদিও বিরক্ত গলায় বললেন, 'একবার তোর হাতে টাকা চলে গেছে, এই টাকা কি ফেরত আসবে? অভ্যাসটা বদলা। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে যার-তার কাছে টাকা চাইবি। টাকা ধার চাওয়া আর ভিক্ষা চাওয়া

একই।'

'তোমার কাছে ভিক্ষা চাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।'

বড় আপার মনের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে গেল। তিনি সুটকেস থেকে কাপড় নামিয়ে রাখছেন। আমি বললাম, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি এটা আবার কাউকে বলবে না।'

'আচ্ছা যা, বলব না।'

আমার শেষ কথাটাও তাঁকে খুশি করার জন্যে বলা। আপাকে কিছু গোপন করতে বললেও তিনি খুব খুশি হন। এবং কথাটা জনে জনে বলে বেড়ান। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের পরিবারের সব সদস্যই জানবে যে, তিনি আমাকে শার্ট কেনার জন্যে তিন শ টাকা দিয়েছেন। আসল দাম আড়াই শ। ফাঁকি দিয়ে পঞ্চাশ বেশি নিয়েছি। পুরো ঘটনা বলার পর বলবেন, থাক, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। বেচারা লজ্জা পাবে। আমাকে বলেছে কাউকে না জানাতে।

আমাদের বাসার একটি অলিখিত নিয়ম হচ্ছে— পুরুষরা আলাদা খাবে, মেয়েরা আলাদা।

রাতের খাবার খেতে বসেছি। আমি, বাবা এবং মেজোভাই। বুনোভাই খবর পাঠিয়েছেন তিনি নিজের ঘরেই খাবেন। তাঁকে যেন খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়। ভাগ্যিস মা এই হুকুম শুনতে পান নি। শুনতে পেলে হইচই বেঁধে যেত। বাথরুমে পড়ে গিয়ে মা কোমরে ব্যথা পেয়েছেন। মুখে বলছেন তেমন কিছু না কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে আবহেলা করার মতো ব্যথা না।

খাবার-দাবার তদারক করছেন বড় আপা। আজকের সমস্ত রান্না তাঁর। প্রতিটিতেই লবণ কম হয়েছে। এই খবরটা বললে, তিনি কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করবেন। আমরা কিছু বলছি না। শুধু বাবা বলে ফেললেন, বিনা লবণে রাঁধা ব্যাপারটা কী বল তো?

আপা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ইচ্ছে করে লবণ কম দিয়েছি।'

'ইচ্ছা করে কম দিবি কেন?'

'তোমার জন্যেই কম দিলাম। লবণ খেলে প্রেসার বাড়ে।'

'জিনিসটা মুখে তো দিতে হবে। ভাত খেতে বসেছি, ওষুধ তো খেতে বসি নি।'

বড় আপার মুখ কালো হয়ে গেল। বাবা খাবার ফেলে উঠে পড়লেন। এরকম তিনি কখনো করেন না। তাঁর আজ মনটা ভালো নেই। বড় আপা থমথমে গলায় বললেন, 'বস, ডিম ভেজে দিচ্ছি।'

বাবা বসলেন না। হনহন করে চলে গেলেন।

মেজোভাই হাসিমুখে বলল, 'আমার কাছে তো লবণ পারফেক্ট বলে মনে হচ্ছে। এমন চমৎকার একটা তরকারি বাদ দিয়ে ডিম দিয়ে ভাত খাব? 'বড় আপা বললেন,' রঞ্জু, তোর কাছেও কি লবণ কম মনে হচ্ছে? 'আমি হাসিমুখে বললাম,' না তো। ঠিকই তো আছে।'

'তাহলে বাবা এরকম করল কেন?'

'বাবার শরীর ভালো না।'

বড় আপা চিন্তিত স্বরে বলল, 'আসলেই তাই। কাল রাতে রিমিকে বাথরুম করাতে নিয়ে যাচ্ছি—দেখি বারান্দায় একটা মোড়ার উপর বাবা চুপচাপ বসে আছেন। আমি বললাম, 'এখানে বসে আছ কেন? বাবা বিড়বিড় করে কী-সব বলল, বুঝলামও না। তরকারিটা ভালো হয়েছে?

'অসাধারণ!'

'রংটা সুন্দর হয়েছে।' কেমন টকটকে লাল। কীভাবে হল বল তো?'

'জানি না। কীভাবে?'

'রান্না শেষ হবার পর আধ চামুচ ফুড কালার দিয়েছি। তোর দুলাভাই ব্যাংকক থেকে এনেছিল। আধ চামুচ দিলেই রক্তের মতো লাল হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'রক্তের মতো লাল হওয়াটা কি ভালো? মনে হবে না রক্ত খাচ্ছি?'

'দূর পাগলা।'

পরিবেশ হালকা হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে নীতু এসে খেতে বসল। বিকেলেই নীতুর সঙ্গে মেজোভাইয়ের কঠিন ঝগড়া হয়েছে—সেই ঝগড়ার কথা এখন আর নীতুর মনে নেই। এই বয়েসী মেয়েদের মন নদীর পানির মতো। কোনো কিছুই এরা জমা করে রাখে না। ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নীতু বেশ হাসিমুখে মেজোভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে।

'ভাইয়া, তোমার এক নম্বর বান্ধবীর সঙ্গে আজ দেখা—শ্রাবণী। ফুটপাতের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফুটপাতের দোকানগুলিতে ছিট কাপড় দেখছিল।'

'তাই নাকি?'

'আমার একটা অবজারভেশন কি জান ভাইয়া? আমার অবজারভেশন হচ্ছে ফুটপাতে সবচে' বেশি ঘোরাঘুরি করে বড়লোকেরা। এটা এদের এক ধরনের ফ্যাশন।'

'হতে পারে।'

'আমি উনাকে বললাম, কী, ভালো আছেন? মনে হল চিনতে পারল না। বড়লোকদের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল হয়। ইস, কী কুৎসিত রং হয়েছে তরকারিটার! মনে হচ্ছে রেড পেইন্ট খাচ্ছি।'

মেজোভাই চোখের ইশারায় নীতুকে থামিয়ে দিলেন। ভাগ্যিস, বড় আপা সামনে নেই। নীতু নিচু গলায় বলল, 'ভাইয়া, তোমরা এই তরকারি খাচ্ছ কী করে? লবণ তো একেবারেই নেই।'

'চুপ করে খা।'

নীতু মুখ বেজার করে খেতে শুরু করল। মেজোভাই বললেন, 'একটা খবর দিয়ে তোদের আজ চমৎকৃত করে দিতে পারি।'

নীতু বলল, 'কোনো খবরেই আমি চমৎকৃত হব না।'

'এটা শুনলে চমকে যাবি। আমি তানিয়াদের বাসায় গিয়েছিলাম।'

নীতু সত্যি সত্যি চমকাল। মেজোভাই বললেন, 'কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যাই নি, জাস্ট সোস্যাল ভিজিট। ঠিকানাটা ছিল। ঐদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম'...নীতু হেসে ফেলল।

মেজোভাই বলল, 'হাসলি যে?'

'অন্য কথা ভেবে হেসেছি। তোমার সোস্যাল ভিজিটের সাথে আমার হাসির কোনো সম্পর্ক নেই। তানিয়ার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী কথা জানতে পারি?'

'তেমন স্পেসিফিক কোনো কথা না—তবে যা বুঝতে পারলাম, তা হচ্ছে এই মেয়ের প্রচুর টাকা। বুনোভাই বলছিল, এদের হাতে টাকা-পয়সা নেই। যা ছিল বাপের চিকিৎসায় সব শেষ হয়েছে। এটা ঠিক না। এই বাড়ি ছাড়াও তাদের আরো একটা বাড়ি আছে—গুলশানে। সেই বাড়ি থেকে ভাড়াই আসে মাসে ত্রিশ হাজার।'

'ভালো কথা।'

'আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে—বুনোভাইয়ের ধারণা ঠিক না। বুনোভাইয়ের ধারণা—এই বাড়ি মেয়েটা তার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য দিয়েছে এবং দিয়ে কষ্টে পড়েছে। দ্যাটস নট ট্রু।'

'তোমার কি ধারণা মইনুদ্দিন চাচা আমাদের উপহার দেবার জন্যে এ বাড়ি বানিয়েছিলেন?'

'হতে পারে। সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার মতো না। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীর্ঘদিন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। এই সব কথা মনে করে...।'

নীতু আবার হাসল। হাসতে হাসতে বলল—'বাড়ি বাড়ি করে তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।'

'মাথা এলোমেলো হবে কেন? পুরো ব্যাপারটা এ্যানালিসিস করছি।'

'তানিয়া কি তোমাকে চা-টা খাওয়াল?'

'খাওয়াবে না কেন? চমৎকার মেয়ে। এ দেশে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। গুলশানের বাড়ি বিক্রি করার কথা বলছিল, তার থেকে মনে করছি দেশে থাকবে না। ভদ্রলোকরা আজকাল আর দেশে থাকে না। আমি অবশ্যি সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করি নি।'

'তুমি এক কাজ কর ভাইয়া, শ্রাবণীর পেছনে পেছনে না ঘুরে এই মেয়ের সঙ্গে ভাব কর।'

মেজোভাই রাগী গলায় বললেন, 'ফাজলামি করছিস নাকি?' নীতু হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ ফাজলামি করছি। চট করে রেগে যাবার মতো কিছু অবশ্যি করি নি। আর তুমি যদি রেগে যাও সেটাও তোমার জন্য খারাপ হবে। আমি এমন সব কথা বলব যে সহ্য করতে পারবে না। আমি যেমন ফাজলামি করতে পারি, তেমনি কঠিন কথাও বলতে পারি।'

আমি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম। তারা দুজন দুজনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে না। এ যেন চেয়ে থাকার একটা প্রতিযোগিতা। যে প্রথম চোখ নামিয়ে নেবে সে হেরে যাবে। মেজোভাই হেরে গেলেন। তিনিই প্রথম চোখ নামিয়ে নিলেন। নীতু বিজয়ীর ভঙ্গিতে বসে আছে।

মেজোভাইয়ের এই বান্ধবীর সঙ্গে আমার আগে কখনো কথা হয় নি। আজ কথা হল। সন্ধ্যার আগে আগে তিনি বাসায় এলেন। আমি দোতলা থেকে দেখলাম। বেচারিকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। মনে হয় অনেক দূর থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছে। দুপুরে খাওয়া হয় নি।

জিতু মিয়া আমাকে এসে বলল, 'আপনেরে ডাকে।'

'আমাকে ডাকবে কেন? আমাকে ডাকে না। ভাইয়াকে ডাকে। তুই গিয়ে বল উনি নেই।'

'বলছি, আফা আপনের সাথে কথা বলতে চায়।'

মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে বসার ঘরে বসে ছিল। আমাকে দেখে আরো যেন জড়োসড়ো হয়ে গেল। তার পরনে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি। সবুজ শাড়িতে মেয়েদের খুব মানায় অথচ এই রঙটা কেন জানি মেয়েরা পছন্দ করে না।

'আপনি কি আমাকে ডেকেছেন?'

'জ্বি।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসুন। প্লিজ।'

আমি বিস্মিত হয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। আমাকে সে একেবারে রাস্তায় নিয়ে এসে নিচু স্বরে বলল, 'আমি যে এসেছি এটা যেন ও না জানে।'

'কেউ জানবে না। অবশ্যি এখন যদি ভাইয়া চলে আসেন তাহলে ভিন্ন কথা। সম্ভবত আসবেন না। কয়েকদিন ধরেই রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে আসছেন। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'ও পরীক্ষা দিচ্ছে না কেন জানেন?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'পরীক্ষা দিচ্ছে না! কী বলছেন এসব?'

'না, দিচ্ছে না। শুধু প্রথম পরীক্ষাটায় বসেছিল। তারপর আর বসে নি।'

'সে কী!'

'আমার বড়ভাই ওর সঙ্গে পড়ে। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করায় খুব রাগারাগি করল। আমার সঙ্গে সে কখনো রাগারাগি করে না। আমার এত মনটা খারাপ হয়েছে!'

মেয়েটির চোখে সম্ভবত পানি এসে গেছে। সে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বেচারি চোখের পানি লুকানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'ভাইয়া পরীক্ষা দিচ্ছে না, আমরা এটা জানতাম না। আমরা জানতাম, সে ঠিকমতোই পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনি কি আরো কিছু বলবেন?'

'আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, থাক, সেটা বলব না।'

'চলুন আপনাকে রিকশায় তুলে দিয়ে আসি।'

'না-না, লাগবে না। আমি যে এসেছিলাম এটা দয়া করে বলবেন না।'

'না আমি বলব না।'

'আচ্ছা, ওর কি কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'কোনো সমস্যা হয় নি। যদি হয়েও থাকে কেটে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'এগার তারিখ আমার জন্মদিন ছিল। ও আসে নি। ওর সঙ্গে তিন বছর ধরে আমার পরিচয়। প্রত্যেক জন্মদিনে সে আসে। এবার আসে নি।'

'এর পরের জন্মদিনে নিশ্চয়ই থাকবেন।'

মেয়েটাকে আমি রিকশায় তুলে দিলাম। তার জন্যে আমার খারাপ লাগতে লাগল। পরীক্ষা না দেয়ার অপরাধ ক্ষমা করা যায় কিন্তু এমন চমৎকার একটি মেয়ের জন্মদিনে উপস্থিত না হওয়ার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

বেচারির নিশ্চয়ই সাদামাটা ধরনের জন্মদিনের উৎসব হয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিও হয়তোবা একজনই। এই মেয়ে নিজের হাতে পায়েস রান্না করেছে। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর তার চোখে পানি এসেছে। জন্মদিনে কাউকে কাঁদানোর অপরাধে কোর্টে নালিশ হয় না। কিন্তু হওয়া বোধহয় উচিত।

মেজোভাইকে পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, 'তোকে খবর দিল কে?'

'আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'পরীক্ষা দিলে না কেন?'

'কী মুশকিল, তোর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'কৈফিয়ত চাচ্ছি না তো। জানতে চাচ্ছি।'

'প্রিপারেশন ভালো ছিল না, কাজেই ড্রপ করে দিলাম। এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। সামনের বছর দেব।'

'পরীক্ষা ড্রপ করেছ এটাইবা বাসায় বললে না কেন? বলার দরকার না? মা তোমার পরীক্ষার জন্য রোজা রাখছেন।'

'রোজা রাখছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এটা তো নতুন কিছু না। সবার পরীক্ষার সময়ই মা রোজা রাখেন। আগে রুটিন জেনে নিয়ে সেই রুটিন মতো....।'

রোজা রেখে মা খুবই ক্লান্ত হয়েছিলেন। ইফতারির পর ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিলেন। এই অবস্থাতেই মেজোভাই তার পরীক্ষা ড্রপ করার কথা বললেন। মা শান্ত ভঙ্গিতে শুনলেন, তারপর ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা যা।

তিনি পরের দিনও রোজা রাখলেন। আগেই মানত করা। কাজেই সবগুলিই নাকি রাখতে হবে।

বাবা পরীক্ষা ড্রপ করার প্রসঙ্গে কিছুই বললেন না। এটাও বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার। আগে সবরকম পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাতে

বসতে হত। কোনটা কী আনসার দেয়া হয়েছে তা বলতে হত।

মেজোভাই সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে উঠার পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবা প্রশ্ন পড়ার জন্য বসে আছেন। মেজোভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই সব ইঞ্জিনিয়ারিংঙের প্রশ্নের তুমি কী বুঝবে?'

'তুই বুঝিয়ে দে। বুঝিয়ে দিলেই বুঝব।'

'বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না তোমার বোঝার কথা না।'

'তবু কোশ্চেনটা দে। কোশ্চেন দেখতে তো অসুবিধা নেই।'

মেজোভাই মহা বিরক্ত হয়ে কোশ্চেন এগিয়ে দিলেন। বাবা গভীর মনোযোগে কোশ্চেন দেখতে দেখতে বললেন, 'প্রথম প্রশ্নটার আনসার করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'দু' নম্বর প্রশ্নটা তো অংক। অংক না?'

'হ্যাঁ।'

'হয়েছে অংকটা?'

'করে দিয়ে এসেছি। হয়েছে কিনা জানি না।'

'কারো সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে দেখিস নি—মানে ভালো ছেলেদের সঙ্গে?'

'আমি নিজেই তো একজন ভালো ছেলে। আমি আর কার সাথে মিলাব?'

সেই ভালো ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে না। আর বাবা এই প্রসঙ্গে কোনো কথা বলছেন না—এটা ভাবাই যায় না। আসলে বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে। তাঁর এখন কোনো বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তি আছে বলেই মনে হচ্ছে না। রাতে একেবারেই ঘুমোতে পারেন না। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পরও তিনি জেগে থাকেন। বসে থাকেন বারান্দায় জলচৌকিতে। বিড়বিড় করে কার সঙ্গে যেন কথা বলেন।

বুনোভাই বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। এই ডাক্তারের ঠিকানা দিয়েছেন আমাদের পাড়ার ডাক্তার। ইনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। ভদ্রলোকের ব্যবহার ভালো, কথাবার্তা ভালো। প্রশ্ন করেন আগ্রহ নিয়ে। ডাক্তার রোগীকে প্রশ্ন করছে এ রকম মনে হয় না। মনে হয় পরিচিত একজন মানুষ অন্যজনের খোঁজ নিচ্ছেন।

'আপনার সমস্যাটা কী বলুন তো?'

'মনে একটা অশান্তি। বাড়িটা ঠিকমতো বানাতে পারি নি। রেলিং দেয়া হয় নি। ছাদে দুটো ঘর করার কথা ছিল—ড্রাইভার এবং মালীর ঘর।'

'টাকা কম পড়ে গেল?'

'না, কম পড়ে নি। মইনুদ্দিন টাকা পাঠিয়েছিল। যা দরকার তার চেয়েও অনেক বেশি খরচ করে ফেললাম।'

'ও আচ্ছা।'

'ও এখন মাঝে মাঝে আসে। কিছু অবশ্যি বলে না। বন্ধু মানুষ, কী আর বলবে।'

বুনোভাই বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।'

'আপনাকে কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছি। আপনারা দুভাই বরং বাইরে গিয়ে বসুন।'

ঘন্টাখানিক পর ডাক্তার আমাদের ডাকলেন। বুনোভাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আপনার বাবার মাথায় ইলেকট্রিক শক দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁর যা শরীর এবং বয়স আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। হিপনটিক ড্রাগ কিছু দিয়েছি। ঐগুলি চলুক এবং আপনারা এক কাজ করুন, ঐ বাড়ি থেকে আপনার বাবাকে সরিয়ে নিন। গ্রাম-ট্রামের দিকে নিয়ে যান। আরেকটা কথা--আপনারা আপনার বাবাকে ডাক্তার দেখাতে এত দেরি করেছেন কেন? আপনাদের উচিত ছিল আরো আগেই তাঁকে নিয়ে আসা।'

ফেরার পথে বাবা খুব স্বাভাবিক আচরণ করলেন। মেজোভাই পরীক্ষা ড্রপ করে কাজটা খুব খারাপ করেছে এই কথাও বললেন। তার মানে আশপাশে কী ঘটছে তা যে একেবারেই জানেন না—তা না, জানেন। এক সময় বললেন, 'তোর মা এখন আর আগের মতো চেঁচামেচি করে না। বেচারির শরীর দুর্বল হয়েছে। তার দিকে লক্ষ রাখা দরকার। আমাকে ডাক্তার দেখানোর আগে তোদের উচিত ছিল তাকে ডাক্তার দেখানো।'

'তাঁকেও দেখাব।'

'সে স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই মানে না। স্বাস্থ্যবিধি মানলে এরকম হয় না।'

'তা ঠিক।'

'ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চিরতার পানি আর ইসবগুলের ভূষি এই দু'টা জিনিস কম্পলসারি করে দেয়া উচিত। সপ্তাহে একদিন অর্জুন গাছের ছাল।'

'জ্বি। ঠিকই বলেছেন।'

'সব সময় মনটাও প্রফুল্ল রাখা দরকার। যাবতীয় অসুখের মূলে আছে মনের অবস্থা। অসুখটা প্রথমে তৈরি হয় মনে, তারপর তা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আগেকার সাধু-সন্ন্যাসীরা যে দীর্ঘ জীবন লাভ করতেন তার কারণ হল তাঁদের মনে কোনো ঝামেলা ছিল না। মন ছিল নির্মল। বুঝতে পারছিস? নির্মল। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'বাসায়।'

'মইনুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে হয়। হয়তো গিয়ে দেখব বসার ঘরে।'

বুনোভাই বললেন, 'তুমি এই একটা ভুল সবসময় করছ। তুমি ভুলে যাচ্ছ উনি জীবিত নেই।'

'ভুলে যাব কেন? আমার খুব ভালো মনে আছে। লিভার ক্যান্সারে মারা গেল। স্বাস্থ্যবিধি না মানার কুফল। বিড়ি খেত, বুঝলি? বিড়ির গন্ধে তার কাছে যাওয়া যেত না। কতবার বলেছি বিড়িটা ছাড়।'

'টাকা-পয়সা যখন হয়েছে তখনো বিড়ি খেতেন?'

'না, তখন কি আর বিড়ি খাওয়া যায়? এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়িতে চড়ে কেউ কি বিড়ি খেতে পারে?'

বাসায় পৌঁছে বাবা যে কাজটি করলেন তা দেখে আমরা পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম যে, তাঁর জগৎ-সংসার সত্যি সত্যি উল্টে গেছে। আমরা ঘরে ঢুকছি। বড় আপা দরজা খুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। বাবা বড় আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্লামলিকুম। কেমন আছেন?'

বড় আপা সব জিনিস অনেক দেরিতে বোঝেন। বাবা যে তাঁকে চিনতে পারছেন না

তাও তিনি বুঝলেন না। তিনি আদুরে গলায় বললেন, 'এত দেরি হল কেন?'

বাবা তখন অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি তো ঠিক...মানে চিনি ঠিকই, নামটা মনে আসছে না। আপনি কি পাশের বাসা থেকে এসেছেন?'

বড় আপা চেঁচিয়ে কেঁদে-টেঁদে একটা হইচই বাঁধিয়ে দিলেন। মা হইচই শুনে নিচে নেমে এসে ধমক দিলেন, 'এসব কী থাম্ তো। থাম।'

বড় আপা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'বাড়িটা অপয়া। এই বাড়ি আমাদের দিয়ে দেবার পর থেকে এতসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এই বাড়ি তোমরা তানিয়াকে বা অন্য কাউকে দিয়ে দাও।'

মেজোভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কীসের সঙ্গে কী? আপা, তুমি কি দয়া করে চুপ করবে? শুধু শুধু হইচই, চিৎকার।'

'মোটেও শুধু শুধু না। এই বাড়িতে কিছুতেই থাকা যাবে না।'

'আহ, কী যন্ত্রণা! বাড়ি কী দোষ করল তা তো বুঝলাম না। মানুষের অসুখ-বিসুখ হয় না?'

'গাধা, তুই চুপ কর।'

বাবার ঘোর-ভাবটা সম্ভবত কেটে গেছে। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'ঝগড়া হচ্ছে কী নিয়ে?' বড় আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাঁদছিস কেন তুই? এ কী বিশ্রী স্বভাব! কথায় কথায় চোখের পানি। তুই হচ্ছিস সবার বড়। তুই সবাইকে সামলে-সুমলে রাখবি। তা না, কেঁদে অস্থির।'

'তোমার শরীর কি এখন ঠিক হয়েছে, বাবা?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

বাবা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করেছেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠছেন বড় আপা। বাবা বড় আপার হাত ধরে আছেন। যে-মেয়েকে একটু আগেই তিনি চিনতে পারছিলেন না সেই মেয়ের হাত ধরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি এগুচ্ছেন। বড় আপা বললেন, 'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি। মন দিয়ে শোন। আমার তেমন বুদ্ধি নেই। আমি বোকা ধরনের মেয়ে। কিন্তু বাবা, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি—বাড়িটা অপয়া। নীতুরও তাই ধারণা। বাবা, তুমি বাড়িটা কাউকে দিয়ে দাও।'

বাবা কী যেন বললেন, নিচ থেকে কিছু বোঝা গেল না। আমি তাকালাম মেজোভাইয়ের দিকে। তাঁর মুখ রাগে গনগন করছে। অনেক কষ্টে তিনি রাগ সামলাচ্ছেন। পুরোপুরি সামলাতেও পারছেন না। থু করে ঘরের ভেতরই একদলা থুতু ফেললেন। সেই থুতু আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মানুষের হাসিরও অনেক রকম অর্থ হয়। এই হাসির অর্থ হচ্ছে—ভাইয়া, নিজেকে সামলাও।

মার মুখ করুণ। মনে হচ্ছে তিনি কেঁদে ফেলবেন। মার শরীর যে এত খারাপ হয়েছে তা এই প্রথম আমি লক্ষ করলাম। পরিবারের কারোর স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করলে চট করে তা কারো চোখে পড়ে না। হঠাৎ একদিন পড়ে, তখন চমকে উঠতে হয়।

মা আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় নিজের মনে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে রে, বাবু? এসব কী হচ্ছে?'

আজ বিকেলে খানিকক্ষণ বৃষ্টি হল।

বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকালাম ক্যালেন্ডারের দিকে। কত তারিখ? দিন তারিখ সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এ বাড়ির কেউ বোধহয় আজকাল আর দিন-তারিখ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বড় আপার মেয়ে দুটি পর্যন্ত চুপ। তারাও কোনো-না-কোনোভাবে জেনে গেছে—এ বাড়ির সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। কোথাও ঝামেলা হয়েছে। শিশুদের বাড়তি একটি ইন্দ্রিয় থাকে। তারা অনেক কিছুই টের পায়। না বললেও বুঝতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা আমি কী মনে করে যেন ছাদে গেলাম। বৃষ্টি হওয়ায় ছাদ ভিজে আছে। জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা। পিচ্ছিল হয়ে আছে। যে কোনো সময় পা হড়কে যাবার সম্ভাবনা। ছাদে রেলিং নেই। পা হড়কালে আর রক্ষা নেই। এই সম্ভাবনা নিয়েও হেঁটে বেড়াতে ভালো লাগছে। অনেকদিন পর এ বাড়ির ছাদে উঠলাম। আমার মধ্যে তেমন কাব্যভাব নেই। ছাদ আমার ভালো লাগে না। তবে মা প্রায়ই আসেন বলে আমি জানি। এই অসুস্থ শরীরেও আসেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে আসেন।

আমি যে আজ ছাদে এসেছি তার কারণ একটিই—মার সঙ্গে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। মা এখনো আসছেন না। হয়তো বেছে বেছে আজই তিনি আসবেন না। মার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলা কোনো সমস্যা নয়। তাঁর ঘরে প্রায় সময়ই কেউ থাকে না। কিন্তু আমি অন্য ধরনের নিরিবিলি চাচ্ছিলাম।

সন্ধ্যা মিলিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশে মেঘ জমছে। আবার বৃষ্টি শুরু হবে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছি। তখনই মার সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে দেখে অসম্ভব চমকে উঠলেন। যেন ভূত দেখেছেন।

আমি বললাম, 'কেমন আছ, মা?'

মা বললেন, 'ও তুই? চমকে উঠেছিলাম।'

'কী ভেবেছিলে, ভূত?'

মা তার জবাব না দিয়ে বললেন, 'তুই কি প্রায়ই ছাদে আসিস?'

'না। আজ এসেছিলাম।'

'বৃষ্টি-বাদলার সময় আসবি না। পিছল ছাদ। একটা অঘটন ঘটতে কতক্ষণ?'

'তুমি তো প্রায়ই আস।'

'আমার কথা বাদ দে।'

মা আমাকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছেন। তখন হঠাৎ বললাম, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।'

'কী কথা?'

'বাড়ির প্রসঙ্গে একটা কথা। বুনোভাই আমাকে বলেছেন। তিনি শুনেছেন বাবার কাছে। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানতে চাই।'

মা কিছু বললেন না। আমাকে পাশ কাটিয়ে ছাদে উঠে গেলেন। আর তখন বৃষ্টি নামল। আমি দেখলাম, মা ছাদের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। সেই চাদরে তিনি মাথা ঢেকে দিলেন।

আমি মার কাছে এগিয়ে গেলাম। কোমল গলায় বললাম, 'বৃষ্টিতে ভিজছ কেন মা? চল ঘরে যাই।'

'তুই যা।'

মার গলার স্বর কঠিন এবং কান্না-ভেজা। আমি চলে এলাম। বুনোভাইয়ের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি— বুনোভাইয়ের খাটে বাবা জবুথবু হয়ে বসে আছেন। বাবার পিঠে হাত রেখে বুনোভাইও বসে আছেন। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললাম, 'কেমন আছ বাবা?'

তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জ্বি, ভালো আছি। আপনার শরীর ভালো?

বাবা আমাকে চিনতে পারেন নি। ইদানীং কাউকেই প্রথম দর্শনে বাবা চিনতে পারেন না।

আমি বললাম, 'এখানে কী করছ, বাবা?'

'ও আচ্ছা, তুই! রঞ্জু। অন্ধকারে চিনতে পারি নি। বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে?'

'হুঁ।'

'ভালো, ভালো। বৃষ্টি হওয়া ভালো।'

'এখানে কী করছেন?'

'বুনোর সঙ্গে গল্প করছি। আয়, তুইও আয়।'

আমি বাবার পাশে বসলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলেন। সেই হাসিতে স্নেহ ছিল, প্রশ্রয় ছিল। বাবা নরম স্বরে বললেন, 'রঞ্জু, বাড়িটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'সমস্যার কী আছে, বাবা?'

'আছে, সমস্যা আছে। জটিল সমস্যা। তুই ছেলেমানুষ, সমস্যা বুঝবি না। জানালা দিয়ে দেখ তো বৃষ্টি এখনো হচ্ছে কিনা।'

জানালা দিয়ে দেখার কিছু নেই। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। মা কি এখনো ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজছেন?

ঘটাং ঘটাং শব্দে ঘুম ভাঙল।

একেবারে কাকডাকা ভোর। এত ভোরে জিতু মিয়া পানি তোলা শুরু করেছে? কাকদের ঘুমও তো ভালো করে ভাঙে নি। আমি বিস্মিত হয়ে বারান্দায় এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম—বাবা টিউবওয়েলের পাম্প চালাচ্ছেন। তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করছে নীতু এবং বড় আপা। মাও আছেন। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছু বলছেন না।

নীতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'তুমি কাউকে না ধরে দোতলায় উঠতে পার না—আর তুমি পানি তুলছ?' বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার। না মানার জন্য মইনুদ্দিনের অবস্থা তো দেখলি। ফট করে চলে গেল। সে বয়সে আমার এক বছরের ছোট।'

'বাবা প্লিজ, বন্ধ কর। প্লিজ।।'

নীতু বাবাকে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল। বড় আপা বাবার কানে কানে কীসব যেন বলছেন। বাবা তার উত্তরে শুধু মাথা নাড়াচ্ছেন।

মেজোভাইও ঘুম ভেঙে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মুখ কঠিন। মেজোভাই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বড় আপা বাবাকে কী বলছে?'

আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

'বাড়ি নিয়ে কিছু বলছে বোধহয়।'

'মনে হয় না।'

'তাই বলছে। এরা দুজন ক্রমাগত বাবাকে জপাচ্ছে—বাড়ি ছেড়ে দাও। বাড়ি ছেড়ে দাও। মেয়েদের বুদ্ধি। ইডিয়টস!'

মেজোভাই থু করে থুতু ফেললেন। কদিন ধরেই দেখছি তাঁর থুতু ফেলা রোগ হয়েছে। গর্ভবতী মেয়েদের মতো ক্রমাগত থুতু ফেলেন। থুতু ফেলার সময় তাঁর মুখ ঘৃণায় কুঁচকে যায়। কার উপর এত ঘৃণা কে জানে?

'রঞ্জু!'

'বল।'

'ওরা দুজন ক্রমাগত বাবাকে জপাচ্ছে। ক্রমাগত জপাচ্ছে।'

'তা না, উনার শরীর খারাপ, তাই সারাক্ষণ পাশে পাশে থাকে।'

'আমরা সারা জীবন কষ্ট করেছি। এখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—এরা সেই সুযোগ নিতে দেবে না। ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার সময় সাতশ টাকা লাগে। সেই টাকা কীভাবে যোগাড় করেছিলাম জানিস?'

'না।'

শোভাকে বলেছিলাম। সেই বেচারি তার কানের দুল বিক্রি করে টাকা দিয়েছিল। ওদের বাড়িতে জানাজানি হয়ে যেতে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়।'

'তুমি তার জন্মদিনে যাও নি কেন?'

'তোকে কে বলল?'

'আমি আমার এক ফ্রেন্ডের কাছে শুনেছি। অনেক রাত পর্যন্ত বেচারি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। কাজটা ভালো কর নি।'

'মনে ছিল না। খুব আপসেটিং লাগছিল—মানে এখনো লাগছে। আচ্ছা, ও কি এর মধ্যে এসেছিল?'

আমি মিথ্যা করে বললাম, 'একদিন এসেছিলেন। গেট দিয়ে ঢুকে তারপর হঠাৎ দেখি বের হয়ে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি?'

মেজোভাইয়ের চোখ করুণ হয়ে গেল। আমি বললাম, 'তুমি আজ তাদের বাসা থেকে ঘুরে আস না কেন?'

'যাব। দুএকদিনের মধ্যেই যাব। যেতে ইচ্ছা করে না। মেজাজ এমন খারাপ হয়েছে। সবার সাথে শুধু ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে। এখন মনে হচ্ছে বুনোভাই সুখে আছে। দিনরাত শুয়ে বসে...ছিঃ ছিঃ। যে ফ্যামিলির সবচে' বড় ছেলের এই অবস্থা সেই ফ্যামিলি এমন একটা সুযোগ কি ছাড়তে পারে? পারা কি উচিত? তোর কী মনে হয়, উচিত?'

'উচিত না।'

'অফকোর্স উচিত না। এটা হচ্ছে আমাদের সারভাইভেলের প্রশ্ন। আজ যদি এমন হত যে বুনোভাই ভালো একটা চাকরি করছে।—আমি পাস করে জয়েন করেছি, নীতুর বিয়ে হয়ে গেছে...'

'তুমি তো পাস করবেই, আর নীতুরও ভালো বিয়ে হবে। দেখতে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী।'

'আমি পাস-টাস করব না। পড়াশোনাই করব না বলে ঠিক করেছি।'

'কেন?'

'দূর, বেতনের এই দু'তিন হাজার টাকায় আমার কিছু হবে না। বিজনেস করব।'

'বিজনেস করবে? টাকা পাবে কোথায়?'

'টাকা তো আছেই। আমাদের এই জায়গাটাই হবে আমার ক্যাপিটেল। বাংলাদেশে কোটিপতি হওয়া এমন কিছু না। আমি সাত বছরের মধ্যে কোটিপতি হব। তুই কাগজে কলমে লিখে রাখতে পারিস। তখন দশটা পাস করা ইনজিনিয়ার আমার ফার্মে খাটবে। আমি আমার ফার্মের নামও ভেবে রেখেছি। 'The Master Builders."

'যদি বাড়িটা বাবা দিয়ে দেন তাহলেও কি কোটিপতি হতে পারবে?'

'না, তাহলে পারব না।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'বাবা বাড়িটা দিয়ে দিতে পারেন। এই সম্ভাবনা কিন্তু আছে।' মেজোভাই চমকে উঠে বললেন, 'সম্ভাবনা আছে মানে?'

'গতকাল একজন উকিল এসেছিল। বাবা খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন বলে মনে হয়। দরজা বন্ধ করে কী-সব লেখালেখি হল।'

'মাই গড! কী বলছিস তুই?'

মেজোভাই আবার থুতু ফেললেন। তাঁর শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। সেই প্রবল উত্তেজনা অনেক কষ্টে দমন করে বললেন, 'বাবা কোনো দলিলপত্র করলেও তা কোর্টে টিকবে না। কারণ তাঁর মাথার ঠিক নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁর চিকিৎসা করছে। অপ্রকৃতিস্থ মানুষ কোনো দলিল করতে পারেন না। 'আমি খুব হালকা গলায় বললাম,' ভাইয়া, বাড়ির দলিল কিন্তু মার নামে। বাবার নামে না।'

'মার নামে মানে? মার নামে কেন?'

'মইনুদ্দিন চাচা মরবার আগে তাই বলে গিয়েছিলেন।'

'মাকে বাড়ি দিতে বলে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে কে বলল?'

'আমি জানি। বাবা বুনোভাইকে বলেছেন। বুনোভাই আমাকে বলেছেন।'

'মাকে সে কেন বাড়ি দেবে?'

'আমিও তাই ভাবছি। জীবনের শুরুতে তিনি বেশ কিছুদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন, হয়তো তখন মার সেবাযত্নে খুশি হয়েছিলেন। সেটা মনে রেখেছেন।'

'তুই এসব কী বলছিস?'

'বন্ধু-পত্নীকে ছোটখাটো উপহার অনেকেই দেয়। এটা দোষের কিছু না। উনি বড়লোক মানুষ, বড় উপহার দিয়েছেন।'

মেজোভাইয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হতভম্ব ভাবটা তাঁর মধ্যে এখন আর নেই। এখন অসম্ভব রাগে তাঁর চোখ জ্বলছে।

'হারামজাদার এত বড় সাহস! হারামজাদা আমার মাকে অপমান করে?'

আমি সহজ গলায় বললাম, ' অপমানের কী দেখলে ভাইয়া? একজন উপহার হিসেবে একটা জিনিস দিচ্ছে।'

'শুয়োরের বাচ্চা আমার মাকে বাড়ি উপহার দেবে কেন? শুয়োরের বাচ্চা ভেবেছে কী?'

'এত অস্থির হচ্ছ কেন ভাইয়া? তুমি যা ভাবছ হয়তো সেসব কিছুই না। বিত্তবান মানুষের খেয়াল।'

'খেয়াল মোটেই না। মোটেই খেয়াল না। আমার মনে পড়ছে। মার যখন অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইন হল সে মাকে নিয়ে ভর্তি করল সবচে' বড় ক্লিনিকে। সারারাত আমাদের সাথে ক্লিনিকে বসে রইল।'

'এটা তো অন্যায় কিছু না।'

'অন্যায় না মানে? হারামজাদার এতবড় সাহস! এতবড় সাহস ঐ শুয়োরের বাচ্চার!'

হইচই শুনে বুনোভাই বের হয়ে এলেন। মেজোভাই কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'বুনোভাই, রঞ্জু এসব কী বলছে?'

বুনোভাই পরম মমতায় বললেন, 'আয়, তুই আমার ঘরে আয়।' মেজোভাই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। মেজোভাই কিছুতেই যাবে না। হইচই শুনে মা এলেন। বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে রে?'

বুনোভাই বললেন, 'কিছু হয় নি। মা, তুমি যাও তো।'

মেজোভাই চোখ লাল করে বললেন, না, তুমি যেতে পারবে 'না, তুমি থাক। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মা শান্ত গলায় বললেন, 'কী কথা?'

বুনোভাই মেজোভাইকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না। তার মুখ চেপে ধরলেন।

মা ছোট নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মাথার চুল প্রায় সবই পাকা, তবু আজ হঠাৎ করে মনে হল যৌবনে আমার মা অসম্ভব রূপবতী ছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তেও তিনি সেই রূপের কিছুটা হলেও ধরে রেখেছেন।

নীতু বারান্দায় এসে বলল, 'মেজোভাইয়ের কী হয়েছে?'

মা বললেন, 'জানি না।'

বড় আপা খুব কাঁদছে।

কাঁদার মূল কারণ দুলাভাই চিঠিতে লিখেছেন তাঁর ফিরতে আরো দুসপ্তাহ দেরি হবে। সেমিনারের শেষে যে পেপার জমা দেয়ার কথা সেই পেপার তৈরিতে একটু সময় লাগছে। যে চিঠিতে তিনি এই সংবাদ দিয়েছেন সেই চিঠির সঙ্গে কয়েকটা ছবিও পাঠিয়েছেন। সেই সব ছবির একটিতে স্কার্ট পরা একটি মেয়েকে দুলাভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বড় আপার মর্মপীড়ার কারণ এই ছবি। বেহায়া ধরনের একটা মেয়ের গা ঘেঁষে সে ছবি তুলবে কেন? দু'সপ্তাহ বাড়তি থাকছে কেন? এই দু'সপ্তাহ সে কি মেয়েটার সঙ্গে ঘুরার পরিকল্পনা করেছে? আর যদি এ রকম পরিকল্পনা নাও থাকে তাহলেই বা সে থাকবে কেন? এতে তো এই মেয়েটার সঙ্গে 'ঘষাঘষি'র সুযোগ আরো বেশি হবে।

এখন আমাদের পরিবারের একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড যাচ্ছে। এর মধ্যে বড় আপা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। তাঁর কাছে লেখা চিঠি তিনি সবাইকে পড়াচ্ছেন। স্ত্রীর কাছে লেখা স্বামীর চিঠিতে ভালোবাসাবাসির কথা তেমন থাকে না। তবে দুলাভাইয়ের চিঠিতে সেইসব যথেষ্টই আছে। আপা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কাঁদো কাঁদো মুখে সবাইকে চিঠি দেখাচ্ছেন। আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এখন কী করি বল তো?'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'কিছু করতে হবে না।'

'কিছু করতে হবে না মানে? ও এসব করে বেড়াবে আর আমি...'

বড় আপার গলা ধরে এল। আমি বললাম, 'তুমি কী করতে চাও?'

'ওকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে দে।

'কী লেখা থাকবে সেই টেলিগ্রামে?'

'লিখবি আমার খুব অসুখ।'

'এইসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় আপা?'

'তোর কাছে ছেলেমানুষি। আমার কাছে ছেলেমানুষি না। ওকে আমি চিনি। ও মেয়ে দেখলেই এলিয়ে যায়।'

'কী যে তুমি বল।'

'ঠিকই বলি। পুরুষ মানুষ চিনতে আমার বাকি নেই। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে দেখলেই পুরুষ মানুষের মন উদাস হয়। তুই টেলিগ্রাম করবি কি করবি না, সেটা বল।'

'করব না।'

আপা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে শান্ত করবার জন্যেই বলতে হল, 'টাকা

দাও, টেলিগ্রাম করে আসছি।'

'লিখবি অবস্থা খুব সিরিয়াস। ডেথ বেড।'

'ফিরে এসে যখন দেখবেন তুমি দিব্যি ভালো তখন কী হবে?'

'কিছুই হবে না। ও খুশি হবে।'

টেলিগ্রাম করবার জন্যে বড় আপা আমাকে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিলেন। উদার গলায় বললেন, 'টেলিগ্রাম করার পর যদি কিছু টাকা থাকে সেটা ফেরত দিতে হবে না।'

এর মধ্যে বাবার শরীর খুব খারাপ এই খবর পেয়ে তানিয়া বাবাকে দেখতে এসেছিল। অনেকক্ষণ থাকল। চা খেল। নীতুর সঙ্গে গল্প করল। কথায় কথায় বলল, বাংলাদেশ তার ভালো লাগে। কিন্তু বেশিদিন থাকতে ইচ্ছা করে না। বাংলাদেশের মানুষদের কৌতূহল খুব বেশি। বিদেশে কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। যার কাজ তার কাছে। সে এই মাসের শেষেই ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করবে। আজকাল ভিসার খুব কড়াকড়ি করেছে। তবু তার ধারণা, অসুবিধা হবে না। বেশ কিছু ডলার খরচ করতে হয়—এই যা।

তানিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'সবাই আমাদের দেশের বদনাম করে। বলে, টাকা দিলে এই দেশে সবকিছু হয়। আমার নিজের ধারণা টাকায় সব দেশেই কাজ হয়। ঐসব দেশে টাকা বেশি লাগে, আমাদের দেশে কম। এ-ই হচ্ছে তফাত।'

বাচ্চা একটা মেয়ে কিন্তু খুব গোছানো কথাবার্তা। নীতু বলল, 'তোমার বুঝি অনেক টাকা?'

মেয়েটি এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে বলল, 'হ্যাঁ।'

সে মার সঙ্গে কথা বলতে গেল। মা চাদর গায়ে শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন। তানিয়া বিস্মিত গলায় বলল, 'চাচার চেয়ে তো আপনার শরীর বেশি খারাপ। প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন তো এত খারাপ দেখি নি। কী হয়েছে আপনার বলুন তো?'

মা বললেন, 'কিছু হয় নি।'

'অবশ্যই কিছু হয়েছে। ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'ডাক্তার তো দেখাচ্ছি।'

'দরকার হলে আপনি কোনো ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে যান। যেখানে সর্বক্ষণ হাতের কাছে ডাক্তার থাকবে।'

'আচ্ছা দেখি।'

'না, দেখাদেখি না—আপনি এটা অবশ্যই করবেন।'

'তুমি কি চা-টা কিছু খেয়েছ?'

'হ্যাঁ, খেয়েছি। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনার অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। জানেন, বাবার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে বাবা আপনার কথা খুব বলতেন।'

মার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি বিব্রতমুখে আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম। সেই হাসিতে অভয় দেবার চেষ্টা ছিল, মা বোধহয় তা ধরতে পারলেন না।

তানিয়া বলল, 'বাবার যখন খুব অসহায় অবস্থা, আপনাদের সঙ্গে থাকতেন, তখন তাঁর একবার টাইফয়েড হল। সেই সময় আপনি নাকি তাঁর খুব সেবা করেছেন। একবার

সারারাত জেগে তাঁর মাথায় পানিপট্টি দিলেন।'

'এসব কথা থাক, মা।'

তানিয়া থামল না। সহজ স্বরে বলতে লাগল।

'বাবা এসব কথা আগে কখনো বলেন নি। অসুখ ধরা পড়ার পর খুব বলতেন। ব্যবসার জন্যে আপনি আপনার বিয়েতে পাওয়া গলার হার বিক্রি করে তাঁকে টাকা দিলেন। ঐ দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। বাবা বলতেন, পবিত্র কিছু টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করেছিলাম বলে এতদূর আসতে পেরেছি। চাচি, আমরা এসব তো কখনো শুনি নি। যখন শুনলাম আপনার প্রতি খুব গ্রেটফুল বোধ করলাম।'

মা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'মা, আমার খুব মাথা ধরেছে। তুমি ওদেরকে নিয়ে গল্প কর।'

'আরেকটু বসি। আর কখনো দেখা হবে কিনা কে জানে, আমি চলে যাচ্ছি। আচ্ছা চাচি, আপনি নাকি একবার গল্প করতে করতে বাবাকে বলেছিলেন, আপনার যদি কখনো টাকা হয় তাহলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ধবধবে শাদা রাঙের একটা বাড়ি বানাবেন। বলেছিলেন, তাই না চাচি?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা সেই কথা মনে রেখেছিলেন। এই বাড়িটা ঠিক সেই রকম করে বানানো। আপনি কি কোনোদিন সেটা বুঝতে পারেন নি?'

মা জবাব দিলেন না। নীতু বলল, 'চল আমরা ছাদে যাই। ছাদটা খুব সুন্দর। বাগানবিলাস গাছে ছাদটা ঢেকে ফেলেছে।' তানিয়া নীতুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, 'আমরা গোড়া থেকে জানি এই বাড়ি আপনার। আর আপনারা কেউ কিছুই জানতেন না। মজার ব্যাপার না? বাবার অবশ্যি ভয় ছিল আপনারা এই বাড়ি নিতে রাজি হবেন না। আপনারা যে রাজি হয়েছেন আমার এত খুশি লাগছে!'

মার মুখ আরো ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

মেয়েটির উপর আমার খুব রাগ লাগছে। মা কষ্ট পাচ্ছেন—এই বোকা মেয়ে কি তা বুঝতে পারছে না?

'চাচি!'

'কী মা!'

'আপনার তরুণী বয়সের অসম্ভব সুন্দর দুটা ছবি আমাদের বাসায় আছে। শাদা-কালো ছবি। স্টুডিওতে তোলা কিন্তু এত সুন্দর। আপনার নাকি ছবি তোলার দিকে কোনো আগ্রহ ছিল না। বাবা জোর করে তুলিয়েছেন। আমি আপনাকে ছবি দুটা পাঠিয়ে দেব।'

'দরকার নেই, মা।'

'আমি পাঠাব। ছবি দেখলে আপনার ভালো লাগবে। আমি এখন উঠি, চাচি?'

'আচ্ছা মা।'

বারান্দায় মেজোভাইয়ের সঙ্গে তানিয়ার দেখা হল। তানিয়া বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

মেজোভাই জবাব দিলেন না, ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন। সেই চোখে আগুন ধকধক করছে।

তানিয়া চলে যাবার পর মেজোভাই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ঐ মেয়েটার চোখ ব্রাউন, তুই লক্ষ করেছিস?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'মইনুদ্দিন চাচার চোখও ব্রাউন।'

'তাতে সমস্যা কী?'

'সমস্যা কিছুই না। তুই আলোমতো চিন্তাভাবনা করে বল তো আমাদের পাঁচ ভাইবোনের কারো চোখ ব্রাউন কিনা?'

'ভাইয়া, তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল?'

'মাথা খারাপ-ভালো প্রশ্ন না। আমি তোকে একটা প্রশ্ন করেছি, তুই 'হ্যাঁ' বা 'না' বলবি।'

'ছিঃ ভাইয়া।'

মেজোভাই অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একবার মনে হল হয়তো তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন আমার উপর। আমি ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম।

রাতে ভয়ংকর একটি দৃশ্যের অবতারণা হল।

রাত তখন প্রায় বারটা, বুনোভাইয়ের ঘর থেকে ক্রুদ্ধ হুংকার শোনা যেতে লাগল। ছুটে গিয়ে দেখি বুনোভাইয়ের মতো মস্ত মানুষ মেজোভাইকে সমানে কিলঘুসি মেরে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে মেরেই ফেলবেন। বুনোভাইয়ের চোখ টকটকে লাল। আমার মনে হয়, যে-প্রশ্ন ভাইয়া আমাকে করেছিলেন সেই প্রশ্ন বুনোভাইকেও করেছিলেন। অসুস্থ শরীরে মা ছুটে এলেন। ভয়ার্ত গলায় বললেন, 'কী হচ্ছে?' বুনোভাই বললেন, 'কিছু না মা, তুমি ঘুমাও।'

মা মেজোভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে?'

মেজোভাই মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'কিছু হয় নি। তোমরা সবাই শুধু শুধু ভিড় করছ।'

আমাদের বাড়িতে দুজন উকিল এসেছেন। মা তাঁদের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলছেন। উকিলদের একজন স্ট্যাম্প সঙ্গে এনেছেন। সম্ভবত বাড়ি নিয়ে কিছু হচ্ছে। মা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কী সিদ্ধান্ত, আমরা কেউ জানি না।

বাড়িটা আজ কেন জানি আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। ধবধবে শাদা রঙের বাড়ি। একটু দূরে দাঁড়ালেই আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে বাড়িটা চোখে পড়ে। মনে হয়, নীল আকাশে একখণ্ড ধবল মেঘ। আমাদের শাদা বাড়ি।